চিত্তজিৎ দে
শ্যামাপ্রসাদ সরকার
সম্পাদিত

শ্রী প্রকাশ ভবন

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ : ১৩৬৮

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর
নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

চার টাকা

ভুমিকা

প্রণাম নাও।

প্রণাম কাকে জানাচ্ছি তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম আজ আর কারো অজানা থাকবার কথা নয়।

কিন্তু কেন প্রণাম জানাচ্ছি তাও ভালো করে আমাদের বোঝা দরকার। তা না বুঝলে আমাদের প্রণাম সম্পূর্ণ সার্থক হবে না।

যিনি মহৎ যিনি লোকোত্তর তাঁকেই প্রণামের ভেতর দিয়ে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি আমরা নিবেদন করি।

কিন্তু ওই নিবেদনই কি প্রণামের সার্থকতা?

না। প্রণাম শুধু নিবেদন নয় গ্রহণও বটে।

প্রণাম করে আমরা শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি দিই না, তার বদলে পাই অনেক বেশী কিছু।

মহৎকে প্রণাম করে আমরা পাই মহত্বের আদর্শ ও প্রেরণা, অসামান্যকে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে আমরা তাঁরই প্রাণ-শিখার উদ্দীপনা পাই আমাদের অন্তরে।

আজ যাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি সেই রবীন্দ্রনাথ শুধু মহৎ নয়, মহতো মহীয়ান। ভারতবর্ষের শিয়রে হিমালয় যেমন সমস্ত পৃথিবীর নগাধিরাজ, রবীন্দ্রনাথ তেমনি মানুষের ইতিহাসের এক অতুলনীয় বিরাট পুরুষ।

বিজ্ঞান বলে আজ যেখানে হিমালয়, সেখানে একদিন অনেক অনেক যুগান্ত আগে ছিল সমুদ্র। হিমালয় সেই

সাগরগর্ভ থেকে উঠে সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র ও প্রাকৃতিক রূপই বদলে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর মানুষরাও তেমনি মানুষের ইতিহাস নতুন করে গড়ে তাতে নতুন বেগ দিয়ে যান।

ইতিহাস যে শুধু রাজা রাজড়ার উত্থান পতন জয়-পরাজয় অভিযানের কাহিনী নয় তা আমরা এখন বুঝতে শিখেছি। মানুষের ইতিহাসে ওসব কিছুর দাম যতখানিই হোক তার চেয়ে অনেক বেশী দাম রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের প্রভাবের ও প্রেরণার। মানুষ যে জগতে বাস করে তা'ত শুধু নদী বন প্রান্তর পাহাড় কি বাড়িঘর রাস্তা সেতু দিয়েই তৈরী নয়, সে জগৎ চিন্তা ভাবনা বোধ আর অনুভূতি, আশা আর আদর্শ, ধ্যান আর ধারণা দিয়েও গড়া। চোখে দেখা না যাক এ জগৎ মানুষের কাছে অনেক বেশী দামী ও সত্য।

রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষণজন্মারা এই মনের জগৎই সংস্কার ও সৃষ্টি করে যান। বাইরের জগতের ঝড় কি বন্যা আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই। কিন্তু চোখে যা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক প্রচণ্ড চিন্তার রাজ্যের ঝড় তুলে এঁরা অন্ধ মনের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা দূর করে দিয়ে যান, সত্যিকার নদীর বন্যার চেয়ে অনেক প্রবল প্লাবন এনে এঁরা মিথ্যা ও ভ্রান্তির জগদ্দল বাধা ভেঙে চুরমার করেন। সব রাস্তা যেখানে বন্ধ মনে হয় সেখানে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান দেন, মুক্ত করেন নতুন দিগন্ত।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের যা দিয়েছেন তার পরিণাম বুঝতে একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

আজ এত সহজে যে ভাষা লিখছি তাঁর সারা জীবনের সাধনাতেই তা তার স্থূল আড়ষ্টতা কাটিয়ে এমন সাবলীল শক্তিমান হয়ে উঠেছে।

তিনি আমাদের বুঝতে শিখিয়েছেন ভাবতে শিখিয়েছেন সুন্দরকে চিনতে ও ভালবাসতে শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে সত্যকে সন্ধান করতে ও নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিনি আরো কত কিছু করেছেন শুধু তালিকা দিয়ে বোঝানো যাবে না। শ্রদ্ধাভরে সারাজীবন ধরে তা গ্রহণ করতে পারলে আমরা ধন্য হব।

আমাদের প্রাণের প্রদীপে তাঁর অনির্বাণ শিখার স্পর্শ লাগুক এই প্রার্থনা জানিয়ে আজ শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে বলি

প্রণাম নাও

এই প্রসঙ্গে

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে; সারা পৃথিবীতে এ বছর তাই ইতিহাস হয়ে রইলো। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কিশোর সঙ্কলন গ্রন্থনার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম বার বার। ইতিপূর্বে যতদূর মনে পড়ে এই জাতীয় প্রচেষ্টা আর হয়নি। বর্তমান সঙ্কলনের রচয়িতা গুরুদেবকে স্মরণ করেছেন কেউ পদ্যে, কেউ বা গদ্যে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত কিশোর মনে রবীন্দ্রনাথকে আঁকবার যে প্রবাহ চলে আসছে 'প্রণাম নাও'য়ে তারই সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে।

রচনা সংগ্রহের ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকার মৌমাছির সাহায্য পেয়েছি; 'আনন্দমেলা'র পাতায় রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত রচনাগুলি থেকে এই সংকলনে অনেকগুলি রচনাই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পুরোনো মৌচাকের ফাইল দিয়ে শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, অন্যান্যভাবে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর শ্রীসুশীল রায় আমাদের সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সঙ্কলনের নামকরণ, ভূমিকা ও রচনা দিয়ে আমাদের অসীম ঋণী করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা পুপুর ছবিটি, তাঁরই হাতের লেখায় স্ফুলিঙ্গ কবিতাটি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবিটির জন্য বিশ্বভারতীর সৌজন্য স্বীকার করি।

যাঁর উদ্দেশ্যে এই সংকলন আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই—বলি, 'প্রণাম নাও'।

চিত্তজিৎ দে
শ্যামাপ্রসাদ সরকার

সূচীপত্র

† 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' থেকে

প্রণাম নাও

স্ফুলিঙ্গ

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৭৭ সালে অঙ্কিত পেন্সিল-স্কেচ অবলম্বনে

পঁচিশে বৈশাখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বলেছিলে,-'নাই বা মনে রাখলে···
সে কথা যে মিথ্যে তা'ত জানতে !
মনে কেন, মর্মে আছ,
গহন গভীর হৃদয় হ'তে
ছড়িয়ে আছ শেষ চেতনা-প্রান্তে
আছ প্রাণের পরম ক্ষুধায়,
নয়ন শ্রবণ ভরা সুধায়,
এই জীবনের প্রতি পাতায়
নিত্য তোমার সই থাকে।
দিয়েছ সুর দিলে ভাষা
আকাশলোভী বিরাট আশা।
প্রণাম লহ মুগ্ধ মনের
আজ পঁচিশে বৈশাখে।

মর্ত্য হইতে বিদায়

সজনীকান্ত দাস

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্রবাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

সারাদেহ জুড়ি প্রদোষে উষায় নভচারী পাখীদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধূনন,
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।
রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায় ?   পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে ?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুতবাহু
হয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি দ্রুমিছে এরণ্ডেরা ?

লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে,
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি ;
তবু আমি জানি, আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,
অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।

ধূসর রৌদ্র ভাল নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল ;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর—
রহি রহি আজো ধারা বর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম ;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই ;
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী ?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।

প্রণাম নাও

শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

হায়রে উপমা, বিকল উপমা যত !
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে।
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি-চলা "বিরাট নদী"র জলে !

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।
যত দেখিয়াছি, তত করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে ?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা দেখেছ কেউ ?
আকাশ—আড়াল—করা ব্যবধান একদা নিশীথশেষে
চকিতে দেখেছ বাতাসে উড়িয়া গেছে ?
সহসা দেখেছ বিস্মিত আঁখি মেলে
হিমালয় নাই, ধু-ধু করিতেছে সীমাহীন প্রান্তর,
ধু-ধু করিতেছে বালি-ঝলসানো সুবিশাল মরুভূমি—
মরীচিকাহীন ভয়াবহ মরুভূমি ?
মহাহিমালয়ে ভাঙিতে দেখেছ কেউ ?

পাদমূল সহ দেবতা-আত্মা হিমচূড়া হিমালয়ে
মৃত্যুর মত কালো কুয়াশায় ঢাকিতে দেখেছ কেউ ?
রবির উদয়ে যে কুয়াশা কভু শূন্যে মিলাবে নাকো,
যে কুয়াশা ছেদি হাসিবেনা হিমালয় ;
সুনীল আকাশপটে কোনদিন তুষারশীর্ষ গিরি
জাগিবে না আর—কারো মনে এই জেগেছে সম্ভাবনা,
কঠিন সম্ভাবনা ?
ভাঙ্গিতে কেহ কি দেখিয়াছ হিমালয়ে ?

বিফল উপমা, কোথা হিমালয়-নদী-গুহা-আশ্রয়,
কোথা কালিদাস রঘুকুমারের কবি ?
চিতার ভস্ম উড়িছে কি আজো রোদনমুখর
রেবা মালিনীর কূলে,
স্মৃতিমন্দির উঠেছে কি কোনো, প্রভাতবেলায়
পুণ্যলোভীরা সবে
চন্দনমাখা শুভ্র কুসুম উদ্দেশে তাঁর দিতেছে শ্রদ্ধাভরে ?
হরপার্বতী-মিলন কাহিনী সুরসিক জন পড়িতেছে
যুগে যুগে,
কুতূহলী মোরা পড়ি অবকাশকালে—
ঘরে ঘরে সবে করি যে কামনা কুমার কার্তিকেয়ে ;
বৈদেহী সাথে ফিরিছে রাঘব শূন্য বিমান-পথে,
আজো দেখি মনে সেই পুরাতন ছবি—
কলকোলাহল-মুখরিত এই নগর কলিকাতায় ।
হায়রে উপমা, বিফল উপমা যত,
সকল উপমা হারাইয়া যায় ক্ষণিকের খেলাঘরে ;

হায়, 'ক্ষণিকা'র কবি,
আঁধার নেমেছে "কৃষ্ণকলি''র হরিণনয়ন ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার "ময়নাপাড়ার মাঠে'' ।

* * *

পূর্ণিমাচাঁদ দেখিনি ডুবিতে, আঁধার শ্রাবণনিশি—
শুনিয়াছিলাম শঙ্খঘণ্টারোল,
মেঘগর্জন-অবকাশে মোরা শুনেছিনু সকলেই
ঝুলন-পৌর্ণমাসী রজনীতে সঘন শঙ্খরব ;
বরষাবিদ্ধ তন্দ্রামগ্ন নগরী সে কলিকাতা,
চিৎপুর রোডে বন্ধ হয়েছে যানবাহনের চলা,
মেঘের আড়ালে দেখিনু সহসা হাসিল শারদশশী ।

তীর্থযাত্রী একেলা পথিক বৈতরণীর তীরে
সম্বলহীন, তাই তো শঙ্কাহীন—
ওপারে চাহিয়া এপারের ছবি দেখিছে পথিক
ধ্যান নিমীলিত চোখে,
এপারের রবি ওপারে ডুবিতে চায়,
এপারে ওপারে আমাদের মাঝে দুস্তর পারাবার ।

মহামানবের প্রাণ—
মানবের মাঝে চিরজীবী প্রাণ—সুন্দর ত্রিভুবন—
জীর্ণ খাঁচায় আজ পলাতক মরণোন্মুখ প্রাণ,
ভুবনের রূপ চির-অমলিন—তবুও বিবাগী প্রাণ,
শিয়রে তাঁহার জাগিছে কয়টি প্রাণী ।
জাগে আর তারা প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস গুণে গুণে,

প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস রোধ করি,
প্রহর গণিয়া প্রতীক্ষা করে সবে।
শ্রাবণরজনী শিথিল চরণে প্রখর রৌদ্রে কখন আত্মহারা,
প্রভাত হইল রাখী-পূর্ণিমা-দিন,
মাটির ধরনী রাখিতে নারিল তবু
বিদায়প্রার্থী বিবাগী সন্তানেরে।
দূর হতে দেখি জীবনের বুকে মৃত্যুর নিঃশ্বাস
ওঠে আর ভেঙ্গে পড়ে।
সুশুভ্র ফেনশীর্ষ বারিধি মেলি তরঙ্গবাহু
অভ্যাসবশে তটেরে ধরিতে চায়—
মিথ্যা সে খেলা, আমি জানি তার গভীরেতে অনুরাগ।
বিদায়-বারতা শুধু নিঃশ্বাসে—শান্ত ললাট-পট,
পাণ্ডু ওষ্ঠে স্ফুরে না বিদায় গান ;
পিছু ফিরিবার নাহি কোন ব্যাকুলতা,
যাবার বেলায় পিছু ডাকিবার ছিল না সেদিন কেউ।
সে মহাপ্রাণের শিয়রে জাগিয়া কটি অসহায় প্রাণী—
মূঢ় বিস্ময়ে সহসা দেখিল তারা—
দেখিল সহসা দ্বারে জনতার ভীড়।
মাটির পৃথিবী চঞ্চল হয়ে বাহু বুঝি মেলিয়াছে—
বিদায়প্রার্থী রাখিতে সন্তানেরে ;
তখন সময় নাই।
আকাশে বাতাসে শুধু শোনা যায় অস্ফুট কানাকানি,
প্রাণমৃত্যুর চিররহস্য কথা—
নিগূঢ় গোপন কথা।
মৃত্যুর কথা কেহ বলিল না, "বারোটা তেরো মিনিট"—

কণ্ঠে কণ্ঠে অতি অসময়ে সময়ের পরিমাপ,
মহাকাল-গতি চকিতে থামিল যেন—
এপারে ওপারে ঘুচে গেল ব্যবধান,
প্রাণমৃত্যুর সব রহস্য শেষ।

আসিল পরম ক্ষণ—
সারা বনভূমি আলোড়ন করি মরিল বনস্পতি,
ভেঙ্গে গেল হিমালয়।

মৃত্যুরে যেবা প্রলুব্ধ করি ডাক দিয়েছিল অর্ধশতক ধরি
মৃত্যু তাহারে নিয়ে গেল শেষাশেষি ;
নিয়ে গেল ভালবেসে—
রক্ত-অধর নিবিড় চুমায় পাণ্ডুর হ'ল কিনা,
হিসাব তাহার পারেনি রাখিতে কেউ।
গোধূলি-লগনে যায়নি পথিক স্তিমিত অন্ধকারে,
পাখীরা তখনো ফিরে আসে নাই নীড়ে।
দিনের রৌদ্র যখন প্রখরতম
মর্ত্য হইতে বিদায়-বারতা রটিল মর্ত্যভূমে,
মর্ত্য-মানব মোরা—
"স্বর্গ হইতে বিদায়ে''র কবি—নিমীল তাঁহার চোখে
বিদায়-অশ্রু কেহ কি দেখিয়াছিল ?
হায় কবি, হায়, সুন্দর ত্রিভুবন !

স্তম্ভিত ভয়ে শুনেছিনু সবে আর্ত ঘোষণা সেই,
আকাশের পানে তুলিয়া চকিতে শত উৎসুক আঁখি

দেখেছিনু সবে, খর-রবিকরে নিখিল পুড়িয়া যায়—
অকরুণ নীলাকাশ।

মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত—
অমর কবির চরম সে পরিণাম ;
স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম কানে শ্রাবণ-দ্বিপ্রহরে,
বিস্ময়ে দেখিলাম,
নিশ্চল দেহে সকল জ্বালার শেষ।

সুতীব্র কশাঘাতে—
অলক্ষ্য সেই অকরুণ কশাঘাতে
দেহে মনে যেন উঠিনু চকিত হয়ে,
চীৎকার করি বলিবারে চাহিলাম—
বলিতে চাহিনু চরম অবিশ্বাসে,
"মর্ত্য-মানব মোরা—
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস-হবার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"
ক্ষণ-বিস্মৃতি-ক্রোধে বেদনায় চাহি অপলক চোখে—
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে—

জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে,
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হ'ল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল না কানে
মর্ত্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।
সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

* * *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো
মেঘে মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।
মানুষের কাঁধে কাঁধে চ'লে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক-অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

* * *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;

সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হ'ল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

রবীন্দ্রনাথ

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব আপন-মন্থনে
ক্ষুব্ধ প্রাণের ক্রন্দনে
জন্ম দিল চন্দ্রকে···
চন্দ্রকে !

মুগ্ধ মনে মগ্নরে
দেখছিল সে স্বপ্নরে !
হায়রে নিয়ম-নৃত্য কি !
চন্দ্র সে যে জন্মিয়াই
উতল করি সব হিয়াই
লাগলো আলোর বন্ধনে
বিশ্বমনের মন্থনে
নিত্য কি !

বিশ্বমোহন চন্দ্র সে
নিত্যভুবন-বন্দ্য সে
জন্মাল ফের কোন ক্ষণে
চিত্ত করে আকুল কি !
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ?

যত পাখি গাইছিল
ভোরের আলোর খং পেয়ে··

রবীন্দ্রনাথ

যত পথিক ধাইছিল
পথ বেয়ে.......
থম্‌কে গেল চম্‌কে যে !
চিরকালের স্বপ্ন রে
সকল পাখির তান ল'য়ে
উঠল বুঝি গান হয়ে......
অবাক সুরস্নিগ্ধরা
পাখিরা আর পথিকরা
এবং গৃহতৃপ্তরা
শুনল মনের ছন্দ সে
স্বপ্নকে।
সে সুর বুঝি, হায় মিছে নয়,
সে গান বুঝি আর কিছু নয়,
আদ্যিকালের বিশ্বমায়ের
বুকফাটা
চাঁদের আলোর সুরকাঁটা......
সেই সবই !
নিখিল কবির চিত্তপায়ের
পথহাঁটা
সুরের ধ্বনি রাখলো ধরি
অমর করি
নিত্যকালের এই কবি।
আনলো সুরের সুরধুনী,
বুনলো গানের সুরবুনুনি
চাঁদের আলোর মাকুর কি ?
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ?

তোমার গান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমি যে গান গাই, তোমার গান গাই।
যে-সুরে গান গাই, তোমার সেই সুর।
তোমার সুরে আমি তোমার গাই গান।

তোমার গান গেয়ে তোমার কাছে যাই।
তোমার কাছে গিয়ে ঊষর বন্ধুর
মাঠের বুকে শুনি নদীর কলতান।

তোমার গান আছে, এখনও আশা তাই,
আবার ভোর হবে, আঁধার হবে দূর।
আবার ভেঙে যাবে নিশার ব্যবধান।

তাই ত গান গাই, তোমার গান গাই।
যে-সুরে গান গাই, তোমার সেই সুর।
তোমার সুরে আমি তোমার গাই গান।

তোমার গান গেয়ে তোমাকে পেতে চাই।

তুমি আছ

সুনীলকুমার নন্দী

প্রাণের বিস্তারে ছড়িয়ে আছ তুমি—
দেখালে নীল আকাশ, শ্যামল বনভূমি,
স্নিগ্ধ নদী জল।
এবং তারি পাশে
দেখেছি খা খা মাঠ, তপ্ত নিশ্বাসে
বনের পাতা ঝরে,—তুলতে চায় ছবি
ব্যাকুল রঙ ঢেলে, প্রাণের ভৈরবী
আর্তধ্বনি তোলে সুরের গঙ্গায়—
কে বলে তুমি নেই! বহতা সংজ্ঞায়
রক্তে মিশে আছ। অশেষ সান্ত্বনা!

কবিতা-গল্পে যে তীব্র যন্ত্রনা
উৎস খুঁজে মরি তোমারি উৎসাহে—
প্রাণের বিস্তার ভ্রূকুটি হিমবাহে
থামেনি, থামবে না, প্রবল বেগময়
কত না গতি রেখা সাগরমুখী বয়!

গঙ্গা জলে আজো গঙ্গা পূজো হয়।

রবিঠাকুরের গল্প

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আজ থেকে কতোকাল, ধরো আরো কতোকাল পরে
গালে হাত দিয়ে কেউ ব'সে যদি ভাবে এ-শহরে,
রবীন্দ্র ঠাকুর নামে একজন কবিতা লিখেছে
আলো কিংবা অন্ধকারে বাংলার আকাশের নিচে।
তখন কলকাতা হবে মিশর বা ব্যাবিলন, মহেঞ্জোদাড়ো
কিংবা ধরো এই সব কিছু থেকে অনেক পুরনোতর আরো,
সে সময় ছাদে ব'সে কেউ যদি প্রাণ খুলে গায়
আমার সোনার বাংলা, তারা-ভরা আকাশেতে চায়
ঝলমলে সাদা দাড়ি, মাথার রুপোলি রাশি চুল ;
রবিঠাকুরেরই মুখ কারো চোখে ভাসে নির্ভুল ?

তন্ময় হয়ে ভাবে যদি কেউ হাত রেখে গালে
আহা যদি জন্ম হতো রবিঠাকুরের সেই কালে,
একটি আঙুল ছুঁয়ে দেখতুম সোনার কপালে॥

রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তুমি আছো আকাশ ভরে বাতাসে নিশ্বাসে
তুমি আছো নদীর ঢেউয়ে মাটির বুকে ঘাসে,
তুমি আছো ঋতুর রঙ্গে
শীত বসন্ত সবার সঙ্গে

তুমি আছো রঙিন পাখায় প্রজাপতির নাচে
তুমি আছো ছোট্ট শিশুর গোমরা মনের কাছে
তুমি আছো ফুলের গন্ধে
ভোরের হাওয়া মৃদুমন্দে,

তুমি আছো রাতের ঘুমে দিনের জাগরণে,
তুমি হলে পরশমণি বিশ্বজনের মনে।
তুমি আছো কান্নাহাসির এ বিশ্বমৌচাকে
তোমাকে মনে পড়ে না শুধু পঁচিশে বৈশাখে।

হিজিবিজি ছন্দমাখা

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

কোথায় কবি—রবিদাদু
তারায় তারায় হারা ;
আজকে তোমায় কি দেবো ; তাই
ভেবেই আমি সারা।

কি দেবো আজ কি দেবো এই
এমন শুভ দিনে ;
পুতুল, টুতুল সে সব কিছু
চাইনা দিতে কিনে।

তাইতো দিলেম তোমার পায়ে
ছন্দস্থুরে ভরা
হিজিবিজি ভাঙ্গা-গড়ার
দু-চার লাইন ছড়া।

সবুজতীর্থ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বিশ্বকবি !

যেদিন প্রথম আমায় ডেকে তোমার চিঠি
এল, এখনো সেই দিনটি আসে তোমার স্পর্শ
মেখে ।
দেখছি···সবুজ শালতরুরা রোদ-ছায়া মিলিয়ে
স্বপ্নকুটির গড়ে খেলা করছে কবিদের সাথে ।
পৃথিবী যে তাদের কাছ থেকে আর দূরে
থাকবে না, তোমায় ঘিরে, তার বাঁশী কী উচ্ছল
সুরে উঠছে বেজে !
সে কোন্ অদেখা চিঠি পৌঁছল, লেখা
তোমার নামের অক্ষরে, ভোর না হতেই আজ
পাচ্ছি আমার বাংলাদেশে, সারা পৃথিবীকে !
তরুণেরা উঠে আসছে নিঃশঙ্ক বুক, উঠছে
বেজে তাদের উৎসবের শঙ্খ ! স্বপ্নপুরীর
তোরণ খুলে দিয়ে, সত্যেরা বেরিয়ে আসছে
দল বেঁধে ।
ইচ্ছে করে, প্রথম দিনের কথা আর আজের
কাহিনী মিশিয়ে, তোমায় লিখি চিঠি ।
কোথায় লিখব ! সবখানে যে তোমার কথাই
সুরু হয়েছে । সবুজ দলের দেশে, তাদের
সাথে, কবিগুরু, লিখলেম প্রণাম, এই কলমেই,
চিরসবুজেরা দিচ্ছে তোমায় অঞ্জলি যে অমর
অমলতীর্থে ।

রবীন্দ্রনাথ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১

এখানে নামলো সন্ধ্যা।
সূর্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্র-পারে তোমার প্রভাত হলো ?
তুমি বলেছিলে,
গগনে গগনে নব নব দেশে,
নূতন জনম লভি'
তুমি আবার জাগবে নব নব প্রাতে,—
রবি-হীন এই প্রদোষ-আলোকে
আমরা চেয়ে রইলাম,
তিমির-বিদার তোমার সেই উদার অভ্যুদয়ের দিকে···
আজ তুমি নাই,
একথা আমরা ভুলে যাব,
একদিন তুমি ছিলে,
এই অপরূপ বিস্ময়ের ধ্যানে···

২

তুমি ছিলে,
এর চেয়ে বিস্ময় আমাদের আর কিছু নেই,
তুমি আর হিমালয়,
ভারতের দুই চিরন্তন-বিস্ময়,

পৃথিবীর বুক চিরে,
আদি-সমুদ্র থেকে উঠেছিলে,
পৃথিবী ছাড়িয়ে মেঘ-লোকের সীমা ছাড়িয়ে,
ভারতের তপস্যার ঘনীভূত মূর্তি,—
তোমাদের তুঙ্গ-শৃঙ্গ
আজও ক্ষুদ্র মানবের দৃষ্টির অগোচর···
তোমার পাদমূলে,
তোমার অঙ্গ-বাহী নদীতে অবগাহন করি,
তোমার অরণ্যে অরণ্যে
ফল ফুল লতা আহরণ করি,
আর শুধু বিস্ময়ে চেয়ে থাকি,
দেশ-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে
তোমার সীমাহীন বিরাটত্বের দিকে···
যে-বিস্ময়ের চোখে,
একদা এই ভারতের এক প্রান্তে
ধনঞ্জয় পার্থ দেখেছিল
পুরুষোত্তমের বিশ্ব-রূপ।
তোমার পূজায়
বিস্ময় ছাড়া আর কোন উপচার আমাদের নাই

৩

মৃত্যু আজ তোমার জীবনে এসে
জীবন পেলো।
এই পৃথিবীর যা কিছু মৃত্যুময়
যা কিছু ধূলির ধন,

যা কিছু শোকে দুঃখে বেদনায় বিরহে
ম্লান হয়ে যায় শুকিয়ে,
তুমি আমাদের সেই সব মৃত্যুময় ক্ষণিক সম্পদ
মৃত্যুহীন অক্ষয় করে,
তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে গেঁথে গেঁথে,
অনাদি কালের অক্ষয় ভাণ্ডারে
আমাদের জন্যে সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছ।
তোমার কাছে,
তোমার সন্তানরূপে,
উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা আজ যা পেলাম,
জগতের কোন সম্রাট,
কোন ধনকুবের,
সম্মিলিতভাবে তা রেখে যেতে পারেনি···

৪

যে-তারার আলো
আজও পৃথিবীতে আসেনি,
তুমি তোমার মনে পেয়েছিলে সে-তারার আলোর সন্ধান,
তাই দিয়ে তুমি জ্বালিয়ে গিয়েছ গানের প্রদীপ···
যে-তারার আলো,
আকাশে আকাশে গিয়েছে নিভে,
তুমি তাদের সেই নিভে-যাওয়া আলোর
হাজার টুকরো কুড়িয়ে এনে,
জ্বেলে গিয়েছ সুরের প্রদীপ...
তৃণে আর ফুলে, ফুলে আর ফলে,

আকাশের তারায় আর পৃথিবীর ধুলোর কণায়,
সকলের মধ্যে রয়েছে যে প্রাণের ধারা,
তুমি দেখেছিলে সেই অনাদি প্রাণ-ধারার
অখণ্ড প্রবাহ,
তার দুই তীরে তুমি সৃষ্টি করে গিয়েছ
নব নব স্বর্গ,
মাটির পৃথিবীতে ভাবের বৈকুণ্ঠ-লোক।

৫

দেবতারা একদা যে-পথ দিয়ে পৃথিবীতে আসতেন,
পৃথিবীর ধুলোয় সে পথ গিয়েছিল ঢেকে,
তাই পৃথিবীর মানুষকে অমৃতের লোভ দেখিয়ে
দেবতারা ডাকতো স্বর্গে,
তুমি এসে, স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝখানে
যাতায়াতের সেই পথ,
কালের অসীম ধুলো থেকে মানুষের চোখের
জলে ধুয়ে আবার আবিষ্কার করলে,
অশ্রুতে, বেদনায়, বিরহে অপরূপ এই
পৃথিবীকে,
তুমি আবার সাজিয়ে গেলে মোহিনীর বেশে,—
যার জন্যে স্বর্গে উঠবে অশান্তধ্বনি,
দেবতার মন কাঁদবে পৃথিবীতে আসবার জন্যে,
মাটীর প্রদীপের আলোয়,
দুঃখের অভিসারে আসবে দেবতারা।

৬

তুমি নাই।
আমাদের পৃথিবীতে আজ গড়ে উঠছে তোমার
সেই নূতন পৃথিবী···
আমরা চেয়ে আছি,
কখন সেখানে আসবে আকাশ থেকে
দেবতার দল,
নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষের দল ··
তাদেরই আগমনী, হে কবি,
গেয়ে গেলে তোমার গানে গানে, সুরে সুরে,
কলিত-বাণী শত ললিত ছন্দে।
আজ তুমি নাই,
এ কথা আমরা ভুলে যাব,
আবার তুমি আসবে,
সেই অপরূপ আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায়।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা সবাই তখন খুব ছোট। তখন সব ছেলে মিলে মাথা খাটিয়ে একটা ইস্কুল ইস্কুল খেলা বার করা গেল। তাতে আমরা সকলে ভর্তি হলুম।

সেই ইস্কুল বসত, দেউড়ী থেকে দারোয়ানদের বেঞ্চিগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীর পূবের রাস্তাতে। সে ইস্কুল-খেলায় দীপুদা মাঝে মাঝে মাষ্টার হয়ে এসে বসতেন।

নীচে খেলা হয়। রবিকাকা থাকেন তাঁর বাড়ির উপরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে খেলা দেখেন।

মাঝে মাঝে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে জল খাওয়া হত। খেলা ভাঙলেই ফিরিওলার কাছ থেকে ছোলা-ভাজা কিনে খাওয়ার ধুম পড়ে যেত। এইরকম রোজই চলে।

তারপর পরীক্ষার সময় এসে পড়ল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলে প্রাইজ দেবে কে? ভেবে-চিন্তে রবিকাকাকে নিমন্ত্রণ করা হল, প্রাইজ দেবার জন্যে। সেই প্রথম আমাদের রবিকাকার সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে যোগ।

তারপর বড় হলুম। তখন আর রবিকাকার সঙ্গে ছোট-বড় ভাব নেই। উনি লেখক, আমি আর্টিষ্ট, এস্রাজ বাজাই! সেই সময় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এসে জুটলেন, তিনি মেতে থাকতেন হাফটোন ব্লক নিয়ে। ছবি ছাপা নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ হত।

কথা উঠল, শিশুদের জন্যে কিছু করা যাক। রবিকাকার মাথায় প্রথম এল, একটা সিরিজ বার করা যাক। নাম দেওয়া হল বাল্য

গ্রন্থাবলী সিরিজ। তখন শিশুদের পড়বার মত বই ছিল না। তিনি বল্লেন, "তুমি গল্প লেখো।"

আমি ভয় পেলুম। কারণ ও-সব আমার আসে না। সে কথা অন্য লেখার আগেই বলেছি। কিন্তু আপত্তি টিক্‌ল না। আমার ওপরে ভার পড়ল শকুন্তলা লেখবার। আমি লিখলাম "শকুন্তলা", "ক্ষীরের পুতুল" আর রবিকাকা লিখলেন একখানি ছোট কবিতার বই "নদী"—ওখানা যে ছোটদের জন্যে ওতে লেখা নেই বটে, কিন্তু ওটা বালকদের জন্যেই লেখা।

ছেলেদের জন্যে ওঁর ভাবনা বরাবরই ছিল—তাঁর বাল্যকাল থেকেই। আমাদের ইস্কুল খেলাতেও বালকবালিকাদের কথা ভেবে লেক্‌চার দিয়েছিলেন। আজও শান্তিনিকেতনে বসে সে ভাবনা ছাড়তে পারেন নি। তিনি কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার "ক্ষীরের পুতুল" গল্পটি নেওয়া।

এইখানেই রবিকাকার বিশেষত্ব। ছেলেদের নিয়েই তিনি আছেন, শিশুদের ওপরে তাঁর অগাধ টান। এমন-কি যারা কিছু বোঝে না, সেই খুব-কচি শিশুদেরও জন্যে কি লেখা যেতে পারে তা-ও তিনি ভাবেন। এদেশের আর কোনো কবির সম্বন্ধে এ-কথা বোধহয় বলা যায় না। কিন্তু কবিদের জীবন এইরকম হওয়া উচিত—রামধনুর সাতটি রংএর ভিতর দিয়ে তার গতি। সব-বয়সের মানুষ নিয়েই কবিদের থাকতে হবে। সকলের সহিত যে চলতে পারে তাই হচ্ছে সাহিত্য, আমার এই মত। আর্টিষ্টদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। আমি তাই নন্দলালকে মাঝে মাঝে বলি "ছেলেদের জন্যে তুমি কি করলে?" ছেলেদের ছেড়ে কবি হওয়া

যায় না। এখনও এদেশে ছেলেমেয়েদের মনোমত নাটক কি অপেরা কেউ লিখলে না। এক রবিকাকার "ডাকঘর" "বাল্মিকী প্রতিভা" আর "হেঁয়ালী নাট্য" "তাসের দেশ" ইত্যাদি ছাড়া আর বই কে লিখছে বল ?

শিশুদের পঁচিশে বৈশাখ

ক্ষিতিমোহন সেন

পঁচিশে বৈশাখ। এই দিনেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই দিনটি তিনি ধন্য করে গেছেন। আমাদের মধ্যে জন্মনিয়ে তিনি আমাদেরও গৌরব দিয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশবাসী বলে আমাদের দায়িত্বও যে অনেক বেড়ে গেছে সে কথাও ভুললে চলবে না।

কবিগুরুর ছবি তোমরা সবাই দেখেছো। তোমরা ছেলেমানুষ কাজেই তাঁর বুড়ো বয়সের ছবি হয়তো তোমাদের চোখে বেশি পড়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, তিনি যতই বুড়ো হয়েছেন, ততই যেন তাঁর রূপ আরও অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখে মুখে দিনে দিনে যেন অপরূপ একটি নবীনতা ও দিব্যভাব ফুটে উঠেছে।

আসলে বাইরে থেকে তাঁকে বুড়ো দেখলেও তাঁর মনটি ছিল একেবারে শিশুর মত তাজা ও নবীন। তাই শিশুদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ভাব ও হৃদয়ের যোগ। শিশুদের সঙ্গে ভাবের ও মনের যোগ কয়জনের থাকে? আমাদের ঘরের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের কথা আমরা তো ভাল করে জানিই না। কারণ, তাদের আমরা ডেকে স্নেহকরে তাদের সব কথা শুনতে তো চাই না। আমাদের কাছে আমাদের শিশুরা আমল না পেলেও কবিগুরুর কাছে ছিল তাদের অবারিত গতি। সব সময়েই দেখতাম শিশুদের তিনি আদর করে বসিয়ে অন্তরের সব কথাই হৃদয় দিয়ে শুনতেন। আমাদের শিশুরা যে সব কথা আমাদের বলতে চাইতো না, সে সব কথা তাঁর

কাছে বলতে তাদের একটুকুও সঙ্কোচ হোত না। তাঁর এই স্নেহের মধ্যে শিশুদের প্রতি কৃপার ভাব ছিল না। তিনি শিশুদের শ্রদ্ধা করতেন। শিশুরাই ভবিষ্যতের সৃষ্টিকর্তা এই ছিল তাঁর মত।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য রীতিমত শ্রদ্ধার সাধনা। তার কোথাও ফাঁকি নেই। ছেলেমানুষের সাহিত্যের নামে ছেলেমানুষী করতে গেলে যে দুষ্কৃতি, তার আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমরা কখনো কখনো বা ফাঁকি দিয়ে শিশুদের প্রাপ্য হতে তাদের বঞ্চিত করি, কখনো বা তাদের দেখিয়ে তাদের নাম করে নিজেদের কিছু সুবিধা আদায় করে নিই। এই দুইয়েতেই শিশুদের অপমান করা হয়। সেই অপমানে রবীন্দ্রনাথ বড়ই ব্যথা পেতেন।

এই শিশুদের যাঁরা ফাঁকি দিয়ে সুবিধা করে নিতে চান, তাঁরাও নিজেদের ও দেশের ও দশের কল্যাণ এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎকেই নষ্ট করেন। অশ্বত্থামার জন্য তৈরী কৃত্রিম দুধের মধ্যে দেশের দারুণ দুর্গতির পরিচয়। শিশুদের দেখিয়ে পথে বসে ভিক্ষের ব্যবসা চলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শিশুদের নাম নিয়ে রীতিমত ব্যবসা চলবে। নির্বাক, নিঃসহায় শিশুদের নিয়ে এই সব ব্যবসাদারীর আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। শিশু অশ্বত্থামাদের জন্য যদি জোলো দুধেরই সাহিত্য সৃষ্টি করি, তবে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিজেরাই নষ্ট করবো। কালিদাসের মত যে শাখায় বসে আছি, সেই শাখাকেই ছেদন করার মত মূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর শিশু-সাহিত্য শিশুদের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় ভরপুর। যখনই তিনি শিশুদের কথা ভেবেছেন তখনই তিনি নিজের শিশুস্বরূপটির ধ্যানমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাই শিশুদের কি অপূর্ব চিত্রই তিনি রেখে গেছেন। "কথা ও কাহিনী"র গল্পে শিশুর মনুষ্যত্ব "শিশু ও শিশু ভোলানাথে" শিশুদের

কল্পনা ও মানসদৃষ্টির মাহাত্ম্য, "ডাকঘরে" শিশুর অন্তরের অসীম বিশ্ব-জগতের জন্য ব্যাকুলতা, "শারদোৎসবে" সকল মনিবের হয়ে শিশু-সাধকের ঋণ-শোধের তপস্যা, নানাভাবে শিশুদের সাধনাকে অপরূপ ভাবে প্রকাশ করে কবিগুরু আমাদের সাহিত্যে শিশুদের এক দিব্যলোক দেখিয়ে গেছেন! তাঁর "জীবনস্মৃতি" ও "ছেলেবেলা" প্রভৃতি বইগুলিতে তাঁর শিশুহৃদয়ের ভাবদৃষ্টির যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন জগতের কোন সাহিত্যেই তার সমতুল জিনিষ পাওয়া কঠিন। অনেক মহাপুরুষ দেখেছি, কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের এমন করে ভালবাসতে আর কখনো দেখিনি। শিশুদের এই ভালবাসার মধ্যে তাঁকে কখন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায় দিয়ে বিচার করতে দেখিনি।

প্রায় চৌত্রিশ বছর তাঁর সঙ্গ জীবনে পেয়েছি। দেখেছি যখনই কোন ছোট্ট ছেলে বা মেয়ে এসে তাঁর কাছে কিছু দাবী করেছে তখনই তিনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা যখন তাঁর কাছে কবিতা চেয়েছে, তখন তিনি নির্বিচারে তাদের নানারকমের ছেঁড়া-খোঁড়া খাতায় এমন কি আলগা ছেঁড়া কাগজেও অমূল্য সব কবিতা তখনই রচনা করে বসিয়ে দিয়েছেন! ওগুলো যে তাঁর কবিতার যোগ্য স্থান নয়, সেকথা একবারও মনে করেননি। শিশুরা যখন তাঁর কাছে গল্প দাবী করেছে তখন তিনি মজার মজার সব গল্প করে তাদের তৃপ্ত করেছেন। এমন প্রতিদিনই ঘটেছে।

অরণ্যের ফুলের মত এইরকম বহু কবিতা ও গল্প ফুটে উঠে ঝরে গেছে, এখন আর কোথাও তার দেখাও মিলবে না। আবার এই রকম উপলক্ষ্য ধরেই তাঁর কিছু কিছু ভাল রচনা আমরাও পেয়েছি। তাঁর কতক ভাল ভাল কবিতা ও গল্পের এমনি করে শিশুদের তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে।

আমি যখন তাঁর কাছে এলাম, তখন শান্তিনিকেতনের

শৈশবকাল। শিশুরা সন্ধ্যা হলেই তাঁর কাছে এসে জুটতো। তাঁকে তারা খেলার সাথী বলেইজানতো। শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সেবার আর অন্ত ছিল না! কেউকেউতাঁকে বলতেন, "আপনার সময় অমূল্য, এই শিশুদের জন্য তা কেন এতটা নষ্ট করেন?" কবি বলতেন, "অনেক যত্ন না করলে ফুলবাগান তৈরী হয় না। ফুল ফুটলেও তা রাখতে বা কোথাও তা পাঠাতে খুব যত্ন না করলে চলে না। অথচ শস্য বা বীজ বস্তাবন্দী করে রাখলেও ক্ষতি নেই, যেমন তেমন করে তা যেখানে সেখানে পাঠালেও চলে। আমরা বুড়োরা হলাম বীজের মত। যেমন তেমন করে অবহেলা করলেও আমাদের ক্ষতি হয় না। আমাদের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু ওরা যে ফুল, ওদের স্নেহ চাই, যত্ন চাই। অথচ ফুলের মধ্যেই অরণ্যের সব ভবিষ্যৎ। শস্য ফল বীজ ছাল কাঠ সবারই মূলে ঐ সুকুমার ক'টি ফুল। তাদের অযত্ন করার অর্থই হোলো আত্মঘাত।"

অন্তরে অন্তরে রবীন্দ্রনাথও যে ছিলেন শিশু, তাই তিনি শিশুদের মর্ম বুঝতেন। তাঁর দাড়ি গোঁফ যতই কেন সাদা ধবধবে হোক না, তাঁর হৃদয়খানি চিরদিনই ছিল শিশু হৃদয়ের মত কচি, কাঁচা ও কোমল। তাই যখন তাঁকে না বুঝে আমাদের মধ্যেই কেউ আঘাত ও অপমান করেছেন তখন এই দেশের সেরা ফুলটিকেই আঘাত করা হয়েছে। ফুলের মতই সুন্দর হয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন, ফুলের মতই তিনি ছিলেন নির্মল ও পবিত্র, আর জীবনের অবসানে বিধাতার চরণে ফুলের মতই পুষ্পাঞ্জলিরূপে তিনি আত্মসমর্পণ করে চলে গেছেন। তখনকার দিনে আমরা কয়েকজন অধ্যাপক বহুকাল তাঁর সঙ্গে একই জায়গায় পাশাপাশি ঘরে বাস করেছি। সকলেরই ঘরে যে ছোট্ট সব ছেলেমেয়ে।

সর্বদাই আমাদের ভয় ছিল কখন গিয়ে এরা সব তাঁর অসুবিধা

ঘটাবে। তাই সব ঘরেই মায়েদের দিনরাত চেষ্টা ছিল শিশুরা যেন ওঁর কাছে না যায়। কিন্তু কার সাধ্য শিশুদের ঠেকিয়ে রাখে? তিনি নিজেই তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁর কাছে গেলেই ওরা টুকিটাকি সব খবর পায়। এটা-ওটা করে সবই পায়। সকলের উপরে তাঁকেই পায়। তিনি স্নেহের ধারায় শিশুগুলোকে একেবারে আপনার করে নিয়েছেন। আমরা যখন শিশুগুলোকে সামলাবার কথা ভাবছি, তখন দেখি শিশুরদল দিব্যি তাঁর চারিদিক ঘিরে বসে রয়েছে, ইচ্ছে মত তাঁকে গানের ফরমাস করছে, আর তিনিও মনের আনন্দে শিশুদের মনের মত গান শোনাচ্ছেন। গান দিয়ে, কবিতা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, তিনি শিশুগুলোকে একেবারে বশীভূত করে রেখেছেন। শিশুদের জ্ঞান কম হতে পারে কিন্তু তারা হৃদয় চেনে, স্নেহ বোঝে। কবির হৃদয় ছিল শিশুদের প্রতি স্নেহে ভরপুর।

যৌবনকালে কবি অনেক সময় শিলাইদহের কাছে পদ্মানদীর উপর বোটে থাকতেন। একাই থাকতেন। তার মধ্যেও পারলেই একটি না একটি শিশুকে নিজের কাছে রাখতেন! নিজের ছেলে-পিলে যখন হয়নি, তখন ভাইদের ছেলেপিলে কাউকে কাউকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাদের খাওয়ানো পরানো নাওয়ানো সর্ববিধ সেবাই তিনি নিপুনভাবে করতেন। এই রকম একবার একটি শিশু তাঁর কাছে রয়েছে, রাত্তিরে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠলো। পদ্মা নদী পাগল হয়ে সারারাত মাতামাতি করলে। ভীত শিশুটিকে কবি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে কোনমতে তো রাতটি কাটালেন। ভোরের দিকে ঝড় শান্ত হয়ে এলো, ছেঁড়া মেঘের মাঝে মাঝে অরুণের লোহিত আভা দেখা দিল, তিনি গান রচনা করলেন—

আহা জাগি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥

১৯২৪ সাল, চৈত্র মাস। তাঁর সঙ্গে সমুদ্রে চলেছি। প্রশান্ত মহাসাগর। খুব ক'দিন ঝড় বাতাস চলেছে। কেউ আর মাথা তুলতে পারছে না। কেমন একটা গা বমি-বমি ভাব। এরই নাম সমুদ্রপীড়া। কবির এই বালাই ছিল না। তিনি বেশ আছেন! শিশু আর বুড়োদের নাকি সমুদ্র-পীড়া হয় না। সেদিন সকালে বৃষ্টির পর সুন্দর কাঁচা রোদটুকু উঠেছে। উড়োমাছগুলি প্রভাতের আলোয় উড়ে উড়ে আবার সমুদ্রে পড়ছে ঝাঁপিয়ে। ঘননীল জলের ঢেউ-গুলির উপরে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস, তাতে ভোরে সোনার আলো পড়ে মনে হচ্ছে সোনালী ফেনায় ফেনায় নীল সমুদ্রের অপূর্ব সমারোহ। যেন স্বর্ণভূষণ পীতাম্বর নীলমণি বিষ্ণুর অপরূপ জলদ-নীলকান্তি, বিদ্যুতে জড়িত শ্যামঘন মেঘের শোভা। শীতল সুখকর হাওয়া। শরীরটা একটু ভাল বোধ হতেই ভাবলাম দেখে আসি, এমন সময় কবিগুরু কি করছেন। তাঁর ঘরে তাঁকে দেখলাম না। সকালের হাওয়ায় জাহাজের খোলা ডেকে দেখলাম তিনি বেড়াচ্ছেন। এতক্ষণ তিনি ডেকে একা ছিলেন। তখন তাঁর প্রতিদিনের ধ্যানটি সেরে তিনি পায়চারি করছেন আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে নানা দেশের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তিনি হেসে দেখালেন—"কেমন দিব্যি একটি বন্ধুর দল জোগাড় করেছি, দেখুন তো। ভাবছেন কি করে এদের সঙ্গে কথা কই? শিশুদের কথার দরকারই হয় না। এরা বিনা ভাষাতেই অন্তরের ভাব বুঝতে ও বোঝাতে পারে। তাই নানা দেশের এই সব ছেলেমেয়ে দিব্যি আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে, আমিও তাদের কাছে আমার স্নেহটুকু জানিয়েছি।" তিনি দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের ভেদ মানতেন না। সকল মানুষকেই তিনি জানতেন আত্মীয় বলে। শিশুদেরও সেই ভাব, কাজেই শিশুদের সঙ্গে তাঁর স্বভাবতঃই মিল ছিল।

এখানে দেখলাম, শুধু স্নেহ নয়। শিশুদের তিনি নানা টুকিটাকি ঘুষও দিয়েছেন। কিন্তু, এই সব শিশুরা কি করে তাঁর সঙ্গে গোঁপ দাড়ির ভয়ঙ্কর রকমের পাহারা ডিঙ্গিয়ে তাঁর হৃদয়ের এত কাছে উপস্থিত হতে সাহস পেলো? এরা তো তাঁকে চেনে না, ভাষাও জানেনা। এরা গান বা কবিতাও বোঝে না। তবে তাঁকে বুঝলো কেমন করে? তবু কবির মধ্যে এমন একটি সরল সরস স্নেহময় শিশুর ভাব ছিল যে, যে-কোন দেশের শিশুই তাঁর কাছে আসতে দ্বিধা করে নি। দেশবিদেশে শিশুর দল তাঁর কাছে গিয়ে যা কিছু চেয়েছে, পরম স্নেহে তিনি তা চিরদিনই পূর্ণ করে দিয়েছেন।

মনে আছে সেবারই চীন দেশে হাং চাউ নামে এক অতি সুন্দর হ্রদের তীরে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা আমাদের পয়লাবৈশাখের নববর্ষের পর এসে তাঁকে জানালো "তোমাকে নিয়ে বুড়োরাই তো সভা করেন। সেই সভায় আমাদের কেউ যেতেই দেন না; বলেন,—'তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা গোল করবে।' কিন্তু আমাদের তো তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে হয়। আচ্ছা আমরাই যদি সব ছোট্ট ছেলেমেয়ের দল একত্র হয়ে তোমাকে ডাকি তবে কি তুমি আমাদের কাছেও আসবে?" কবি বললেন, "হাঁ, নিশ্চয় যাবো। খুব দরকারী কাজ থাকলেও তা ফেলে তোমাদের কাছে যাবো।" ওরই মধ্যে একটি একটু বড় গোছের ইংরেজী জানা মেয়ে দোভাষীর কাজ করছিল। তার মুখে কবিগুরুর স্নেহময় কথা শুনে স্নেহলোভী ছেলেমেয়ের দল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ছোট্টদের সেই সভায় কবির সঙ্গে আমরাও গেলাম। অনেক দরকারী কাজ মুলতুবী রেখে তাঁকে সেখানে যেতে হলো। শিশুদের কি আনন্দ! তাদের মুখেচোখে একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উচ্ছ্বাস। কেউ কিছু বলতে পারে না—তবু কেউ তাঁকে ফুল দিচ্ছে, কেউ বা

কোন একটা হাতের কাজ দিচ্ছে, কেউ বা আর কিছু দিচ্ছে। তাতেই কবি কি খুশী! কবি যা বললেন তা অনুবাদ করে শুনিয়ে দিতেই ছেলেমেয়েরাও কি খুশী! কবি বললেন, "আমি কিনা কবি, তাই ফুল ভালবাসি। এই যে আমি আজ তোমাদের মধ্যে বসেছি মনে হচ্ছে যেন আজ ফুলবাগানের মধ্যেই বসে আছি। তাই খুব ভাল লাগছে। আমার দেশে শান্তিনিকেতনে তোমাদেরই মত সব শিশুদের নিয়ে কিছুকাল থেকে আমি একটি ফুলের বাগান করেছি। সেখানে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ রইলো। যদি কখনও যাও তবে দেখবে সেখানেও তোমাদের মত নানা ফুলের দল দিনে দিনে ফুটে উঠছে। তোমরাইতো সত্যিকার ফুল। তোমাদের জনে জনে নানা রঙের শোভা। তাই দেখছি আর মন খুসি হয়ে উঠছে। খুসি হচ্চি, আবার তখনই মনে-মনে উদ্বেগও হচ্ছে। ফুল বড় সহজে নষ্ট হয়, মলিন হয়। তাই উদ্বেগ হয় পাছে তোমরা নষ্ট হও বা মলিন হও। ফুল নষ্ট হলে ফল—বীজ কিছুই হয় না। তোমরাই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বড় দুর্দিন আসছে, তাই আশীর্বাদ করি ও প্রার্থনা করি যেন কিছুতে তোমরা নষ্ট না হও। তবেই একদিন না একদিন তোমরা বড় হয়ে পৃথিবীকে সব দুঃখ দুর্গতি হতে রক্ষা করতে পারবে।" তাঁর সেই ডাকে এখন চীন দেশের কিছু ছেলে-মেয়ে এখানে শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছেন ও আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন।

কবিগুরু চলে গেছেন। পৃথিবীতে আজ দারুন দুর্গতি এসেছে। আজ মানুষের একদিকে অন্তহীন হিংসা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা আর অন্যদিকে অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি। আজ তাই ভাবছি, কবে তাঁর অন্তরের সেই আশীর্বাদটি সত্য হবে। কবে মানব-উদ্যানের ফুলগুলি বিকৃত না হয়ে সত্য ও নির্মল হবে ও পৃথিবীর সব অন্যায়-অবিচার

ও দুর্গতি দূর করবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করবে? কবে পৃথিবী নির্মল হবে, নিষ্কলুষ হবে, ধন্য হবে?

তাঁর আশীর্বাদকে সত্য করতে একমাত্র তোমরাই পারো। তিনি তোমাদের এত ভালবেসে গেছেন। আজ যদি তোমরা তাঁর সেই আশীর্বাদের দায়টি ভুলে যাও, তবে বড়ই দুঃখের কথা হবে। তাই আজ পঁচিশে বৈশাখে তোমরা তাঁর সেই আশীর্বাদ স্মরণ কর। তবেই আবার তোমাদের অন্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর জন্মদিন সার্থক হবে। তোমাদের সাধনার বলে জগতের নীচতা কুটিলতা বিদ্বেষ ও হিংস্রতার মধ্যে সত্য প্রেম কল্যান ও মহত্ত্বের সাধনার প্রতিষ্ঠা হবে। তাহলেই পঁচিশে বৈশাখকে যথার্থ সম্মান করা হবে। উৎসব সার্থক হবে।

কবির রসিকতা

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের রসিকতার নানা গল্প কাগজে বেরিয়েছে। সবগুলি না হলেও অনেকগুলোই তোমরা পড়েছ আশা করি। আমি আজ তোমাদের কয়েকটি ছোট ছোট গল্প শোনাব। সবই যে নূতন তা নয়। একবার কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে সাহিত্যালোচনা ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু তখন মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল এবং থামবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন "এ যে দেখছি ধারাবাহিক উপদ্রব সুরু হলো।" ওই 'ধারাবাহিক' শব্দটি উপভোগ্য। একদিন তিনি আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করছেন চোখ বুজে। এমন সময় একজন পরিচিত দর্শনপ্রার্থী এসে মনে করলেন তিনি ঘুমুচ্ছেন। আগন্তুক তখন নিঃশব্দে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন কবি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, মুখে মৃদু হাসি। একটু অপ্রতিভ হয়ে কবিকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঘুমুচ্ছেন। কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন—

"প্রণাম করিতে এলে
চক্ষু দুটি রাখি মেলে,
জুতো জোড়া পাছে যায় চুরি।"

শেষ ইঙ্গিতটুকু মনের মধ্যে এমনি বিঁধে থাকে যে কখনও ভোলা সম্ভব নয়।

একবার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি গল্প বলছি। যে সময়ের কথা, তখন আমি ছিলাম দৌলতপুরে। শান্তিনিকেতনে এসেছি

কবি-দর্শনে। কবি আমাকে দৌলতপুর কলেজ ও খুলনা জেলা সম্বন্ধে এমন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন যে, ও সব জায়গা সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা ভেবে আমি বিস্মিত হলাম এবং বিস্ময়টা একটু প্রকাশও করলাম। তার উত্তরে কবি একটি গল্প বললেন।

একবার তিনি বরিশাল থেকে কলিকাতায় ফিরছেন খুলনার পথে। সেবার কি একটা যোগ ছিল, ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ যাত্রীরা কবির দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে ঢুকে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। কামরা ভরতি হয়ে গেল। ক্রমে যাত্রীরা কবির বিছানার উপরেই এসে বসতে লাগল। তিনি শুয়ে ছিলেন, অগত্যা উঠে বসে একটা কোন আশ্রয় করতে বাধ্য হলেন। তাতেও তাঁর নিষ্কৃতি নেই। যাত্রীরা তাঁর গা ঘেঁষেই বসল এবং অবশেষে হুঁকো বের করে তাঁকে ধুমাচ্ছন্ন করতে লাগল।

কবি বললেন, "তখন বুঝলাম এ আমার শালার দেশই বটে।" মনে পড়ল খুলনা জেলাতে ফুলতলা গ্রামে কবিপত্নীর পিত্রালয়। খুলনা সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় উপলক্ষ্যে আমি যে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম, এটা হলো তার উত্তর।

কবি অন্যকে নিয়ে রসিকতা করতেন বটে। তাঁকে নিয়ে যদি কেউ রসিকতা করত তাহলে তাও তিনি প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করতেন। একবার তিনি একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বা বক্তৃতা লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, এই উপলক্ষ্যে একখানি বই দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তৎকালীন ভক্ত পার্শ্বচর একজন অবাঙ্গালি অধ্যাপককে অনুরোধ করলেন, লাইব্রেরী থেকে বইখানি আনিয়ে দিতে। তিনি ফিরে এসে বললেন, দেশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষ্যে আশ্রম ও লাইব্রেরীর ছুটি হয়েছে, বই আনা যাবেনা। কবি বিরক্ত হয়ে বললেন, দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে ছাত্ররা মনের

আনন্দে মাঠে মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে আর তিনি বইয়ের অভাবে কাজ করতে পারছেন না ; যেমন করেই হোক লাইব্রেরী খুলে বই আনতেই হবে। অধ্যাপক আবার ছুটলেন, কিন্তু ফিরে এসে জানালেন যার কাছে চাবি তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কবির কাজ সেদিনকার মতো বন্ধ হলো, তাই তিনি অধ্যাপকের অক্ষমতাতে অধৈর্য হয়ে বললেন, "গাধা"। বলে চুপ করে রইলেন। অধ্যাপকও ক্ষুব্ধ হলেন এবং এর প্রত্যুত্তর চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন ইস্কুলের ছাত্রদের 'গাধা'র উপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে দিলেন। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক বুধবারে ধোপা আসে অনেকগুলি গাধা নিয়ে। তাই একটি ছাত্র প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখল "There are many donkeys in the Asram." অধ্যাপক মহাশয় এই বাক্যটির নিচে দাগ দিয়ে প্রবন্ধের খাতা নিয়ে গেলেন কবিগৃহে অতি প্রত্যূষে। গিয়ে দেখেন কবি টেবিলের সামনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তখন অতি সন্তর্পণে খাতাটি খুলে কবির সামনে টেবিলের উপরে রেখে চলে গেলেন। কতক্ষণ পরে যখন ফিরে এলেন তখন কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "you have beaten me hollow" অর্থাৎ আমি একেবারেই হেরে গেলাম। অধ্যাপকের ক্ষোভও মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

কিশোর কবির প্রথম পুরস্কার

নরেন্দ্র দেব

তিনটি ছেলে তারা একসঙ্গে মানুষ হচ্ছিল। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল সমবয়সী, আর একজন তাদের চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট।

সেই ছোট ছেলেটির নাম রবি। জোড়াসাঁকোর প্রকাণ্ড তিন-মহলা রাজপ্রাসাদের মত তাদের বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে প্রশস্ত বাগান, পুকুর, ঘাট। শিলাইদহর মস্তবড় জমিদার তারা। কলকাতার এক বিশিষ্ট পুরানো বনেদী ঘর। বাড়িতে লোকজন, দাসদাসী, খাজাঞ্চী, সরকার, দ্বারবান, গোমস্তা, গুরুমশাই, শিক্ষক, ওস্তাদজী, পালোয়ান, অনেকেই থাকেন।

এঁদের মধ্যে খাজাঞ্চী কৈলাশ মুখুজ্যে ছিলেন ভারি আমুদে লোক। তিনি যেন বাড়ির একজন নিকটআত্মীয়। ছেলেদের ভালবাসতেন। ছেলেরাও তাঁকে পছন্দ করত খুব। কৈলাস খাজাঞ্চী বিশেষ করে সেই রবি ছেলেটির ছিলেন বড্ড বেশি অনুরাগী। ছোট ছেলেটিকে রোজ তিনি বসিয়ে বসিয়ে কত ছড়া বলে শোনাতেন। সে ছড়ার প্রধান নায়ক ছিল সেই বালক। আর, নায়িকা ছিল এক ভুবনমোহিনী বধূ, যার রূপে জগৎ আলো হয়ে উঠত। তার পরনে ছিল রঙীনশাড়ি, তার সর্বাঙ্গে ছিল কত মণি-মাণিক্যের বহুমূল্য অলঙ্কার। নায়ক ছুটে যেত কত দেশ-দেশান্তরে, অসাধ্য সাধন করতে করতে, সেই ভুবনমোহিনীর জন্য।

ছোট ছেলেটির কল্পনায় জেগে উঠতো এক রূপকথার আশ্চর্য সুন্দর রাজ্য। খাজাঞ্চী কৈলাশ মুখুজ্যের মুখে সেই সুন্দর আবৃত্তি শুনে শুনে, সেই সুমিষ্ট ছড়ার শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা

শিশুর মনে ভারি মধুর একটা ভাব জাগিয়ে তুলত। ছেলেটি প্রথম যেদিন তার পড়ার বইয়ে পড়লে—'জল পড়ে, পাতা নড়ে' তার মনে কবিতার ছোঁয়া লেগে গেল। ছন্দের সঙ্গে মিলের মাধুর্য সেদিন যেন তার সেই প্রথম উপলব্ধি হলো। সারাদিন সে মনে মনে গুন্-গুন্ ক'রে আওড়াতে লাগল—'জল পড়ে, পাতা নড়ে!'

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান'—এ ছড়াটিও যেদিন প্রথম রবির কানে এল, বর্ষার সমস্ত রূপ ও সৌন্দর্য যেন মূর্তি ধরে তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে দেখা দিল। রবির মনে হতে লাগল —দাদারা যে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের কথা বলেন, এ ছড়াটি বোধহয় সেই রকম কোন কবি কালিদাসের ছোটদের 'মেঘদূত'!

রবির চেয়ে দু'বছরের বড় যে ছেলে দু'টি, তার মধ্যে একজন হলো রবির দাদা সোমেন, আর একজন তার ভাগ্নে সত্য। তারা দু'জনে যেদিন স্কুলে পড়তে গেল, রবির ভারি ইচ্ছে হলো, সেও তাদের সঙ্গে স্কুলে যাবে। কিন্তু ওদের চেয়ে রবি বয়সে দু'বছরের ছোট বলে সবাই বললে, তোমার এখন স্কুলে যাওয়া হবে না। আরও দু' এক বছর পরে তুমি ভর্তি হবে।

কিন্তু রবি নাছোড়বান্দা। স্কুলে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলো। রীতিমত চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। তখন রবিদের যিনি শিক্ষক ছিলেন, বিরক্ত হয়ে তিনি রবিকে একটি চপেটাঘাত দিয়ে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'এখন স্কুলে যাবার জন্য খুব তো কান্নাকাটি করছো, কিন্তু এরপর স্কুলে না যাবার জন্য হয়ত এর চেয়ে ঢের বেশি কাঁদতে হবে!'

রবির জীবনে মাস্টারমশায়ের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছল। সে কথা তোমাদের পরে বলব। এক্ষেত্রে কান্নার জোরে সেই অল্প বয়সেই রবিকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি

করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শিক্ষালাভ যতটা হোক বা না হোক, শাস্তির বহর দেখে রবির স্কুল সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক এসে গেল। রবি দেখলে, সেখানে পড়া বলতে না পারলে ছেলেদের বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে হাত পাততে বলে, তার হাতের উপর অনেকগুলো শ্লেট একত্র করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম আরও কত শাস্তি ছেলেদের ভোগ করতে হতো স্কুলে।

স্কুলে যাবার ঝোঁকটা তার চেপেছিল স্কুলের টানে যতটা না হোক, স্কুলে যাবার পথের বিবরণটাই তাকে বেশিরকম প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। এর আগে রবি কখনো বাড়ির বার হয়নি। গাড়ি চড়েনি। রাস্তায় পদার্পণ করেনি। তাই দাদা আর সত্য স্কুল থেকে ফিরে এসে যখন রোজই তাকে নূতন নূতন খবর দিত, আর স্কুলে যাবার পথের চিত্তাকর্ষক কাহিনী অতিরঞ্জিত করে বলতো, রবি শুনে স্কুলে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠত। ঘরে আর তখন কিছুতেই তার মন টিকত না। কিন্তু স্কুলে গিয়ে এবং সেখানে শাস্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে, রবি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল।

যাই হোক, এমনি করে তো নিতান্ত শিশু বয়সেই রবির পড়াশুনা সুরু হয়ে গেল। পড়াটা একটু সড়গড় হতে না হতেই রবি হাতের কাছে যে বই পেত, তাই পড়ে ফেলত। চাকর মহলে যে সব বটতলার বই প্রচলিত ছিল, রবি তাও সংগ্রহ করে নিয়ে পড়ত। এমনি করে সেই অল্প বয়স থেকেই রবির সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হলো।

চাণক্য-শ্লোকের বাংলাঅনুবাদ আর কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণই ছিল রবির প্রধান পাঠ্যপুস্তক। ভূতের ভয়ে রামনাম করাটা সব ছেলেই নিরাপদ বলে মনে করে। রবিরও এ বিশ্বাস ছিল। তাই ভয় পেলে, বা কেউ ভয় দেখালে সে একেবারে ছুটে

বাড়ির ভেতর পালাতো। দিদিমার ঘরে ঢুকে তাঁর মার্বেল কাগজে বাঁধানো কোণ ছেঁড়া মলাট-ওয়ালা ময়লা রামায়ণখানি তুলে নিয়ে এসে, মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে কোলের উপর খুলে নিয়ে পড়তে ব'সে যেত।

একদিন বারবাড়ির রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে রবি আনমনে খেলা করছিল, এমন সময় সত্য সেখানে এসে 'পুলিশম্যান পুলিশম্যান' বলে রাস্তার দিকে চেয়ে চীৎকার সুরু করে দিল। কারণ ওরা জানতো, রবিকে ভয় দেখাবার এ একটা মস্ত উপায়! পুলিশ-ম্যানদের রবি ভীষণ ভয় করত। কারণ, রবির ধারণা ছিল যে, কোনও লোককে দোষী ব'লে তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেই, কুমীর যেমন করে তার খাঁজ-কাটা দাঁতের চাপে শিকারকে ধরে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি করে পুলিশম্যানরাও লোককে চেপে ধরে থানার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে কোথায় যেন অন্ধকারের অতলে লুকিয়ে ফেলে!

পুলিশম্যানদের সম্বন্ধে এই রকম ভয়াবহ একটা ধারনা থাকায় সত্যর চিৎকার ও ভাবগতিকে ভীত হয়ে রবি ছুটল একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির ভিতর। পালাবার সময় কেবলই তার মনে হতে লাগল, পিছনে যেন পুলিশম্যান তাড়া করে আসছে। পিছনে ফিরে একবার তাকিয়ে দেখবারও সাহস নেই। সমস্ত পিঠটা ভয়ে কুঁচকে কুঁচকে উঠছে; প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে,—ঐ এসে পড়ল বুঝি! ধরে ফেলল বোধহয়! পিঠে হয়তো এখনি তাদের কর্কশ হাতের স্পর্শ এসে পড়বে!

রবি ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে তাঁকে এই আসন্ন বিপদের কথা জানালে, মা এমন ভীষন খবর শুনেও একটুও বিচলিত হ'লেন না! রবি তখন ঘরের বাইরে থাকা মোটেই

নিরাপপদ নয় ভেবে, দিদিমার রামায়ণখানা নিয়ে বাড়ির মধ্যেই পড়তে বসে গেল। কতক্ষণ পড়ছে বসে কিছুই খেয়াল নেই,—পুলিশম্যান্—সত্যমামা—সব কথাই রবির মন থেকে তখন মিলিয়ে গেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, সে খেয়ালও নেই! মধ্যাহ্ন ছাড়িয়ে কখন অপরাহ্ন এসে পৌঁছেছে, টেরই পায়নি কিছু! রামায়ণের কোনও একটা করুণ ঘটনার বর্ণনা পড়তে পড়তে রবির দুই চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছিল। এই অবস্থায় দিদিমা তাকে দেখতে পেয়ে হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে গেলেন। বই পড়ার এমনি ঝোঁক রবির সারাজীবন ধরেই ছিল।

বড়লোক এবং জমিদারের বাড়ীর লোক হলেও ছেলেবেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবেই রবি মানুষ হয়েছে, ভোগ বিলাসের সমস্ত উপকরণই ছেলেপিলেদের কাছে একদম নিষিদ্ধ ছিল সে বাড়িতে।

তা'ছাড়া ছেলেদের সম্পূর্ণ ভার ছিল সেখানে চাকরদের হাতে। রবিকেও এই চাকরদের শাসনাধীনেই থাকতে হয়েছিল। কাজেই যেমন বেশভূষা ছিল সামান্য, তেমনি খাওয়া-দাওয়াও ছিল নিতান্ত সাধারণ।

চাকরদের মহলেই প্রায় ছেলেদের দিন কাটত। তারা নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য ছেলেদের কোথাও নড়াচড়া একরকম বন্ধই করে দিয়েছিল। কাজেই, সারাদিন প্রায় ঘরের মধ্যেই আটকে থাকতে হতো তাদের। শ্যাম বলে একটি শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা ছোকরা চাকর ছিল রবির অভিভাবক। সে রবিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে রেখে, তার চারিদিকে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে রেখে বলে যেত, "সাবধান! এই গণ্ডীর বাইরে বেরুলেই বিষম বিপদে পড়বে!"

রামায়ণ পড়ার ফলে গণ্ডীকে অবহেলা করার সাহস ছিল না।

ভয় হতো, পাছে সীতার মত দুরবস্থা হয়! কাজেই, জানালার ধারে বসে খড়খড়ির পাখাটি তুলে সারাদিন সে পুকুরঘাটের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিত। কত লোক আসছে—স্নান করে চলে যাচ্ছে—কত রকম তাদের সেই স্নানের ভঙ্গী!

স্নানের পালা শেষ হলে রবি চেয়ে থাকত ঘাটের ধারের সেই প্রকাণ্ড বটগাছটার দিকে, যার তলায় অজস্র ঝুরি নেমে একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এই বটগাছটিকেই উদ্দেশ্য করে কবি একদিন লিখেছিলেন ঃ

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট্ট ছেলেটি, মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট ॥

কখনও বা রবি সারাদিন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে মেঘের নানা পরিবর্তন দেখত। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া মেঘের পেছনে তার মন ছুটত যেন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্রের মতো।

ঈশ্বর নামে এক শুচিবায়ুগ্রস্ত বুড়ো চাকর ছিল ছেলেদের রসদ যোগানোর কাজ নিয়ে। সে একটু আফিম খেত, কাজেই, দুধের উপর তার বিশেষ লোভ ছিল। ছেলেরা কেউ দুধ খেতে না চাইলে সে আর দ্বিতীয়বার তাকে অনুরোধ করত না। রাত্রে খাবার সময় লুচি নিয়েও তার টানাটানির অন্ত ছিল না। একেবারে একখানার বেশি লুচি সে কাউকেই দিত না; কেবলই প্রশ্ন করত—আর চাই? রবি বুঝতে পেরেছিল যে, 'আর চাই না' বললেই ঈশ্বর খুসী হয়। তাই অল্প দু'চারখানা খেয়েই সবার আগে সে ঈশ্বরকে খুসী করত, 'আর চাই না' বলে।

দু'বেলা জলখাবার নিয়েও এই ব্যাপার হতো। দোকান থেকে ছেলেদের বরাদ্দ মত জলখাবার কিনে আনবার পয়সা সে পেত। খাবার আনতে যাবার আগে রোজই সে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করত—

কে কি খাবে ? রবি জানত যে, সস্তার জিনিস ফরমাস করলেই ঈশ্বর খুসী হবে ; কারণ, বাকী পয়সাগুলো তা' হলে ঈশ্বরের বাক্সয় জমবে। তাই রবি তাকে প্রায়ই মুড়ি, ছোলাসিদ্ধ, চীনাবাদাম-ভাজা এইসব আনতে বলত।

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী থেকে কিছুদিন পরে রবি নর্ম্যাল স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছিল। নর্ম্যালস্কুলে পড়বার সময় বাড়ির দোতালার বারান্দায় রবি এক স্কুল খুলে বসল। বারান্দার প্রত্যেক্ রেলিংটি হলো তার ছাত্র। একটা সরু কাঠি যোগাড় ক'রে, বেতের মত সেটাকে হাতে নিয়ে, একখানা টুল পেতে সে বসত ছেলেদের পড়াতে। দুষ্টু ছেলেদের সেকি শাসন। মারের চোটে কাঠের রেলিংয়ের গায়ে ছড়া-ছড়া দাগ প'ড়ে যেত! স্কুলে রবি কোনো সহপাঠী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারত না। অধিকাংশ ছেলের ব্যবহার এত খারাপ যে, তাদের সঙ্গে মেশাটা রবির কাছে অপমানজনক বোধ হতো। মাষ্টারদের মধ্যেও কেউ-কেউ ছেলেদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের সময় অত্যন্ত কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতেন। রবি এই ধরণের শিক্ষকদের কিছুতে শ্রদ্ধা করতে পারত না। তাদের ক্লাশে নিঃশব্দে সমস্ত ছেলের পিছনে গিয়ে সে ব'সে থাকত। কিন্তু পরীক্ষার সময় দেখা যেত, রবি সকল ছেলেদের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে!

রবিকে প্রথম কবিতা লিখতে শেখালেন, 'জ্যোতিপ্রকাশ' বলে তার এক ভাগ্নে। ভাগ্নে হ'লে কি হবে, মামার চেয়ে সে ছিল বয়সে অনেক বড়। রবির তখন মাত্র সাত-আট বছর বয়স। আর জ্যোতিপ্রকাশ তখন সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট ও ম্যাক্‌বেথ পড়ছে!

একদিন দুপুরবেলা জ্যোতিপ্রকাশ রবিকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"তোমায় খুব ভাল কবিতা লিখতে হবে, বুঝেছ?

কিন্তু, কবিতার কতকগুলো রীতিপদ্ধতি আছে। তোমার সেগুলো শেখা দরকার।" তারপর—মিল, ছন্দ, যতি বজায় রেখে চৌদ্দ অক্ষরের যোগাযোগে কি উপায়ে পয়ারছন্দে পদ্য লিখতে হয়, জ্যোতিপ্রকাশ রবিকে শিখিয়ে দিলেন।

রবি তখনও পর্যন্ত ছাপার হরফেই ঝর্-ঝরে তর্-তরে নির্ভুল কবিতা প'ড়ে এসেছে। এ যে নিজে-নিজে চেষ্টা করলে কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব'সে লিখতে পারা যায়, এ ধারণাই তার ছিল না; যেমন 'চোর' সম্বন্ধে রবির ধারণা ছিল—সে একটা ভয়ানক কিছু! কিন্তু, একদিন যখন বাড়ীতে একজন চোর ঢুকে ধরা প'ড়ে গেল, রবি অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে ও বিপুল কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে গিয়ে যখন দেখলে, আর পাঁচজন মানুষের মতো সেও অত্যন্ত সাধারণ একটি মানুষ,—তখন সেই চোরকে ধ'রে দ্বারবানদের সেই নিষ্ঠুর প্রহার রবি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে না। তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হ'ল! রবি সেখান থেকে চলে এল—তার 'চোর' সম্বন্ধে যে একটা ভয়াবহ ধারণা ছিল সেটা ঘুচে গেল।

জ্যোতিপ্রকাশের কাছে হদিস পেয়ে, গোটাকতক শব্দ নিয়ে, সেইভাবে নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই সেটা যখন বেশ একটি পয়ার ছন্দের কবিতা হয়ে উঠল, তখন পদ্য লেখার সম্বন্ধে যে একটা অসাধ্যসাধন-গোছের ধারণা ছিল রবির মনে, সেটা দূর হয়ে গেল।

মহা উৎসাহে একখানি নীল কাগজের খাতা যোগাড় ক'রে নিজের হাতে তাতে পেন্সিলে রুল টেনে, কাঁচা হাতের গোটা গোটা বড়-বড় অক্ষরে লিখতে শুরু ক'রে দিলে। রবির বড়দা ছোট ভাইয়ের এই কবিতা-রচনা দেখে ভারি খুসী হয়ে তাকে খুব উৎসাহ দিলেন এবং বাড়ীর সকলকে ডেকে-ডেকে রবির সেই লেখা শুনিয়ে বেশ একটা গর্ব অনুভব করতে লাগলেন। এই অল্প বয়সেই রবি

প্রথম পদ্মের উপর একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিল।

বয়স সাত-আট বছর হ'লে কি হবে, বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পড়াশুনা করতে হতো রবিকে। ভোর ছটা থেকে বেলা সাড়ে-নটা পর্যন্ত চারুপাঠ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বস্তু-বিচার, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য পর্যন্ত পড়তে হতো। শুধু লেখাপড়াই নয়, ছবি আঁকাও শিখতে হতো। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লেংটি প'রে প্রথমেই এক কালাপালোনের সঙ্গে তাদের কুস্তি করতে হতো। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার ফলে রবির স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছিল। কুস্তির পর সেই মাটি-মাখা গায়েই জামা প'রে পড়াশুনা আরম্ভ হতো।

স্কুল থেকে ফিরে আসবার পর ড্রইং মাষ্টার আর জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারের কাছে শিক্ষা নিতে চলত। সন্ধ্যার পর ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রি নটার আগে ছুটি ছিল না। প্রতি রবিবার সকালে গায়ক বিষ্ণুর কাছে গান শিখতে হতো। মাঝে মাঝে প্রাকৃত বিজ্ঞানও হাতে-কলমে যন্ত্রতন্ত্র-যোগে শিখতে হ'ত। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের একটি ভাবী ডাক্তার-ছেলে এসে, সরু তার দিয়ে জোড়া মানুষের একটি কঙ্কাল নিয়ে অস্থিবিদ্যা সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা-দিত। হেরম্ব তর্করত্ন বলে একজন পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও কাব্য ইত্যাদি পড়তে হ'ত। এমনি করে ছেলেবেলা থেকেই রবি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভের সুযোগ পেয়েছিল। সব-কিছু জানবার—সবকিছু শেখবার একটা প্রবল ও অদম্য আগ্রহ ছিল রবির মনের মধ্যে। দেশ বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াবারও একটা প্রচণ্ড ঝোঁক সেই অল্প বয়সেই রবিকে যেন পেয়ে বসেছিল।

কিশোর কবির প্রথম পুরস্কার

রবি ছেলেটি কবিতা লিখতে পারে, এ খবর স্কুলেও গিয়ে পৌঁছেছিল। একদিন নর্ম্যাল স্কুলের সাতকড়ি মাষ্টার—তাকে পরীক্ষা করবার জন্য ছু'এক পদ কবিতা দিয়ে সেটি পূরণ করতে বললেন।

কবিতাটি হচ্ছে—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই॥

রবি এতে যোগ দিলে—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে॥

ছেলেবেলায় লেখা কবিতাগুলোর এখন আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রবির সেই নীলকাগজের খাতাখানির প্রত্যেক পাতা নূতন নূতন কবিতায় ভরে উঠেছিল। তারই ছু'-এক টুকরো এখানে তুলে দিচ্ছি। এটি একটি ব্যক্তিগত সরস বর্ণনা।

আমসত্ত্ব ছুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

বাংলা পড়া শেষ করে এইবার ইংরেজী শিক্ষায় একটু অগ্রসর হবার জন্য নর্ম্যাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে রবিকে 'বেঙ্গল একাডেমী' নামে এক ফিরিঙ্গীদের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এখানে ইংরেজীর সঙ্গে লাটিনও পড়তে হ'ত তাকে।

রবির পিতার বন্ধু ও অনুচর সদানন্দময় শ্রীকণ্ঠবাবু একদিন ভগবানের উপর লেখা রবির ছুটি কবিতা নিয়ে গিয়ে রবির বাবাকে দেখিয়েছিলেন। রবির পিতা সে সঙ্গীত ছু'টির রচনা দেখে প্রশংসা করেছিলেন এবং এরপর থেকে স্বয়ং এই ছেলেটির শিক্ষার ভার

নিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বাইরে থাকতেন। পাহাড়-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আশ্রম করেছিলেন তিনিই। এখন থেকে বাইরে যাবার সময় তিনি রবিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই কিশোর বয়সে রবির চোখে বোলপুর এমন শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর লেগেছিল যে, বোলপুরকে সেদিন থেকে তিনি যথার্থই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন।

একবার মাঘোৎসবের সময় রবির পিতা রবিকে ও রবির দাদা জ্যোতিকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন চুঁচুড়ার বাগানে ছিলেন। রবি এই বিশেষ দিনটির জন্য কয়েকটি গান রচনা করেছিল।

তারমধ্যে একটি গান হ'ল :

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!"

পরিবারের মধ্যে রবি ও জ্যোতির গীতবাদ্যে খ্যাতি ছিল।

রবির পিতা সেদিন রবিকে তাঁর নব-রচিত সমস্ত গানগুলি একে একে গাইতে বললেন। গান গাওয়া শেষ হলে তিনি খুসী হয়ে বললেন—দেশের রাজা যদি এদেশের ভাষা বুঝত, তাহলে এই কিশোর-কবিকে তারা পুরস্কার দিত। কিন্তু রাজার দিক থেকে সে সম্ভাবনা যখন নেই, তখন আমিই সে ভার নিলুম। এই বলে তিনি কিশোর কবির হাতে পাঁচশো টাকার একখানি চেক দিলেন।

সেদিনের সেই কিশোরকবি রবিই পরিণত বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-রূপে সাহিত্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছিলেন ; কিন্তু সেদিন পিতার কাছে যে প্রথম পুরস্কার তিনি অর্জন করেছিলেন, তা কবির জীবনে ছিল চিরদিনই অমূল্য হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গান

প্রমথনাথ বিশী

সুরে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কাজেই রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কেবল সাধারণ ভাবে বলিবার যোগ্যতাই আমার আছে। শান্তিনিকেতনের জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান আমার মনে যে মায়ারসায়ন সঞ্চার করিয়াছে তাহাই ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাল্যকাল হইতে আমি দুঃসাহসী নাবিকের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; নৌকার হালের উপর তখনো ভাল করিয়া অধিকার জন্মে নাই; যখন যেদিক হইতে বাতাস আসিয়াছে নূতনের আশায় পাল তুলিয়া দিয়াছি; অসহায় নাবিকের দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র বলিয়া আমার কিছু ছিল না; যখন নিতান্ত ভীত হইয়াছি, মাস্তুলের চূড়ায় উঠিয়া একাগ্র চক্ষু হইতে উগ্র সূর্যালোক ঢাকিবার জন্য কপালের উপর বাম করতলের তোরণ সৃষ্টি করিয়া বাষ্পলেখালীন দিগন্তের দিকে তাকাইয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিয়াছি; চঞ্চল ঊর্মিশিখর এক একবার আশার মত কাঁপিয়া উঠিয়া আবার নিবিড় কালিমায় মিশিয়া গিয়াছে; যে ভূখণ্ড একদা মহাদেশ ছিল লবনাম্বুরাশির লক্ষ লক্ষ যুগের আঘাতে আজ তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাদ্বীপপুঞ্জমালায় পরিণত; সে দ্বীপপুঞ্জ কত বিচিত্র, কত সুন্দর, কত অভাবিত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ! যে সংকীর্ণ সামুদ্রিক প্রণালী কার্তবীর্যার্জুনের হাজার হাতের পাঁচহাজার আঙুলের মত দ্বীপমালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

রাখিয়াছে, সেই জলবিচ্ছেদে কত আবর্ত, কত চোরাবালি, কত ডোবা পাহাড়; দূর দিগন্তের হাওয়ার হাহাকার মুক্ত সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জোয়ারকে কেশরভঙ্গাভিরাম উৎক্ষিপ্তফেনমল্লিকা সমুদ্র-গুপ্তের বিজয়ী রথাশ্বের মত চালনা করিতেছে; কোথাও বা আবর্ত ভীষণ উপকূলে মগ্নতরীর ছিন্নপাল শুভ্র ফেনপুঞ্জের মত ঘূর্ণ্যমান; কোথাও বা আহত নাবিকের শিয়রে দ্বিধাগ্রস্থ গৃধ্র; কোনখানে জলরেখা ও স্থলরেখার মাঝে জ্যোৎস্নাফালির মত নির্মল একটা বেলাভূমি, এতই কোমল যে অপ্সরীদের পদরেখাও চিহ্নিত হইয়া যায়; কোনখানে লীলায়িত তরঙ্গবাহুতে শুক্তিরাজি উৎক্ষেপ করিয়া জলদেবীদের মধ্যে যেন কড়িখেলা চলিতেছে, ঘন নারিকেলবনের শাখা সংলগ্ন মরকত গুচ্ছের মত কচি ফলগুলিতে সূর্যালোক ঝলকিয়া উঠিয়া বন্দর প্রয়াসী নাবিকের কাছে অভিনব বাতিঘরের বিকল্প, আর সেই দ্বীপপুঞ্জের উপত্যকাগুলিই বা কত গভীর! বরফগলা জলের নদীতে কি শীত-স্বচ্ছতা! পাহাড়ের পাদদেশে বনরাজি নিদ্রার মত অতলস্পর্শ, তরুশাখার পুষ্পগুলি স্বপ্নের মত অলৌকিক আর সেখানকার তুষারের তুঙ্গতা তপস্তপ্ত মহাদেবের ধ্যানস্বপ্নের মত নির্মল ও অভ্রভেদী।

এই বিচিত্র দেশে কে না ভ্রমণ করিতে চায়! কত না নাবিক এই দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করিয়াছে! কত না লোকে এখানে পৌঁছিয়াছে, আর তারও চেয়ে কত বেশি না লোকে অকস্মাৎ জড়-বুদ্ধি হইয়া হালছাড়া অবস্থায় কোন্ সর্বনাশের অভিমুখে বানচাল হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

গীতিকবিতা শব্দটা আজকাল ব্যর্থপ্রয়োগ, কারণ বহুকাল হইল গীতি ও কবিতায় বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান-গুলিকে সত্য সত্যই গীতিকবিতা বলা চলে। তাঁর গীতিকবিতায়

ঝর্ণার টানে নুড়ির মত সুরের টানে কথা আপনি চলিয়া আসে। এই গানগুলিকে সব সময়ে সচেতন ভাবে গাহিবার আবশ্যক করে না, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পড়িতে বসিলেও এগুলি আপনি গুন গুন করিয়া ওঠে। যথার্থ গীতিকবিতা ভ্রমর জাতীয়, উড়িবামাত্র তাহার পাখা গুঞ্জরণ করিতে থাকে; তাহার পক্ষে উড়া ও গান করা একার্থক।

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মুখে কাব্যাবৃত্তি শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাঁহার পাঠও গানের অনুরূপ ছিল, একটা সুরের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই সুর-সংযোজন করা সম্ভব। শুনিয়াছি, শেষ বয়সে তিনি উর্বশী কবিতাতে সুর-সংযোজন করিয়াছিলেন এবং বিদায়-অভিশাপকে সুরে গাঁথিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, বাক্য ও ধ্বনির মধ্যে কোন্‌টির উপরে তাঁহার বেশী স্বাভাবিক অধিকার ছিল বলিতে পারি না; হয়তো দুটির উপরেই সমান দক্ষতা ছিল, হয়তো বাক্যের চেয়ে ধ্বনির উপরেই বেশি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিঁকিবে। অনেকে বলেন, তাঁহার গান কেবল শিক্ষিত সমাজেরই গান। এ দেশে এখন পর্যন্ত শিক্ষিত-সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ, শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে শিক্ষিত সমাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারও অনিবার্য। মহাকবিদের কাব্যে সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান থাকে, তাই তাঁহাদের ধ্বংস নাই। বাল্মীকির রামায়ণ টিঁকিয়া আছে, কিন্তু কবিগুরুর সময়ে যে-সব 'মাইনর' কবি ছিল, যাঁহাদের কবিতা সেই সময়ের পাঠশালায় খুব চলিত, অনুভূতির সংকীর্ণতাই যাঁহাদের প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল, তাঁহাদের কাব্য আজ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের গান সিন্ধুপারের পাখির মত ঝাঁক বাঁধিয়া আসিত;

এক-এক ঝাঁকে এক-এক জাতের পাখি। মধ্যবয়সের গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি এক ঝাঁকে এক জাতের পাখি। তার আগে তাঁহার জীবনে ঝাঁকে ঝাঁকে গান আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জাত প্রায় এক। আবার শেষের জীবনে ঝাঁকে ঝাঁকে গান আসিয়াছে, তাহারাও প্রায় এক জাতের। এই তিন বয়সের তিন ঝাঁকে বিশেষ জাতিভেদ আছে।

তাঁহার প্রথম বয়সের গান আবেগপ্রধান; শেষ বয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান; প্রথম বয়সের গানের মুখ বিরহ-মিলনপূর্ণ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে; শেষ বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে; মধ্য বয়সের গানে, অল্প কিছুদিনের জন্য এই দুই স্বতোবিরুদ্ধের মধ্যে সেতুবন্ধনের সুর—কখনো তাহার মুখ এদিকে, কখনো ওদিকে; মধ্যবয়সের এই গানের পর্বটিকে রবীন্দ্র-গানের গিরিমালার ওয়াটারশেড বলিতে পারা যায়; ইহার দুই দিকে ভূ-প্রকৃতি দুই রকমের। ইতিপূর্বে মধ্যবয়সে মহত্তর রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ভবের কথা বলিয়াছি তাহার সঙ্গে এই ভাগের ঐক্য আছে; মধ্য বয়সের এই ওয়াটারশেড রবীন্দ্রজীবন ও কাব্যকে দুই ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার জীবনের উত্তরার্ধের গান সত্য সত্যই সিন্ধুপারের পাখি; সিন্ধুপারের কোন দ্বীপে তাহাদের জন্ম, সিন্ধুপারের হাওয়ায় ভর করিয়া তাহাদের আবির্ভাব, এক পাখায় তাহাদের মানুষের বাণী, আর এক পাখায় প্রকৃতির, বুকে তাহাদের নিরুদ্দেশে পাড়ি দিবার উদ্দাম অভিসার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ত্ব বিচার করিতে হইলে জগতের মহাকবিদের সঙ্গে তাঁহাকে স্থাপন করিতে হইবে। সে শক্তির আমার একান্ত অভাব। অন্যান্য মহাকবির সঙ্গে আমার পরিচয় খণ্ডিত, অনেক সময়ে আবার তাহা অনুবাদের দ্বারা

দ্বিধাগ্রস্থ। তবু এইটুকু সাহস করিয়া বলিতে পারি, এত বড় প্রকৃতির কবি বোধকরি জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রকৃতির প্রত্যেক হৃদয়াবেগের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কাহার? প্রাচীনকালের কবিরা প্রকৃতির স্থূলরূপটি মাত্র জানিতেন, প্রকৃতির রাজপথটির সহিত মাত্র তাঁহাদের পরিচয় ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃতি-রাজ্যের গলিঘুঁজি অন্ধিসন্ধি এমনটি আর কে জানে? ভার্জিলের ও সেক্সপীয়রের প্রথম বয়সের কবিতা ছাড়িয়া দিলে আর কাহার কবিতায় এমন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—এমন একাধারে পরিচয় ও প্রীতি? ভার্জিল ও সেক্সপীয়র প্রকৃতিকে ছাড়িয়া মানুষের রাজ্যে ঢুকিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রকৃতির লীলাঘরে আরব্ধ হইয়া মধ্য বয়সে মানুষের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, শেষ বয়সে আবার প্রকৃতির সেই লীলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া 'সমে' ঠেকিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সুরের এই সুরধুনীর উপত্যকায় শান্তিনিকেতন-পল্লী অবস্থিত। এখানকার জীবনস্রোত এই নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া নিত্য প্রবাহিত। তাঁহার সব গান যে আমার মনে আছে, এমন নয়; যে-সব গান মনের প্রত্যক্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছে, বিস্মৃতির নেপথ্য হইতে তাহার স্মৃতির অঙ্গুলিতে কত রকম মানস প্রতিমা রচনা করিয়া জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রেরণ করিতেছে: ইহাতেই শিল্পের সার্থকতা, ইহাই শিল্পের সৃষ্টি কার্য।

সেই-যে সেবার পূজার ছুটিতে জনবিরল আশ্রমে আমরা গুটি-কতক মাত্র প্রাণী ছিলাম, প্রতিদিন শুক্লসন্ধ্যার রাত্রে উত্তরায়ণের ছাদে কবির উপস্থিতিতে গানের আসর জমিত, সে কথা কি ভুলিবার! তারা-নেভা জ্যোৎস্নায় সেই-যে কাহার কৌতুকস্ফুরিত চক্ষু নূতন তারার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত! আবার সেই-যে আর একদিন

শরৎকালের আতপ্ত সন্ধ্যায় নির্জন শিউলিবীথিতে 'হে ক্ষণিকের অতিথি' সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি ভুলিতে পারিব? আর একদিনের কথা মনে আছে, চৈত্রের তপ্ত দ্বিপ্রহরে শিরীষশাখায় বাঁধা দোলনায় দুলিতে দুলিতে বিদায়ের প্রাক্কালে 'যাব যাব তবে, যেতে যদি হয় হবে' গান—সে-যে আজ কতদিনের কথা!

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সোনার ফসল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই, ফসলের এইসব উঞ্ছমাত্র পড়িয়া আছে, জীবন এইসব উঞ্ছেরই স্তূপীকৃত সঞ্চয়; স্মৃতির ভাণ্ডার যাহার জিম্মায় সে সোনার তালগুলি অনাদরে নিক্ষেপ করিয়া উঞ্ছকণাকে তিল তিল সংগ্রহ করিয়া মানসের তিলোত্তমা রচনা করে। স্মৃতির রহস্য ভেদ করিবার স্পর্ধা আমার নাই, কেমন করিয়া ইহা ঘটে জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ইহাই ঘটিতেছে।

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ গত হইয়াছেন। মধুপুরে নির্বাসন যাপন করিতেছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিলাম পাশের বাড়ি হইতে কে যেন 'বীরপুরুষ' কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছে। একি! এ যে বহুদিনের চেনাকণ্ঠ। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সদ্যোভগ্ন নিদ্রার মোহের সঙ্গে সেই কণ্ঠ-স্বরের জাদু মিশিয়া মুহূর্তকালের জন্য সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা গোলমাল হইয়া গেল, নিশ্চিন্ততম বাস্তবকে একবারের জন্য লঘু বলিয়া মনে হইল, কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই আবার বাস্তববোধ ফিরিয়া আসিল—কালের স্রোত কখনো ফিরিয়া বহে না। পাশের বাড়িতে সেই চেনা কণ্ঠের জাদু আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছে। কোথা হইতে অকালবাষ্পে ঘরের চারিদিক এমন ঝাপসা হইয়া উঠিল!

বাইশে শ্রাবণ

বুদ্ধদেব বসু

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘলা দিন ভালো লাগে আমার, বাদলার দিন ভালো লাগে; দশটার সময় ভিজে-ভিজে কাজে বেরোতে হ'লে নালিশ করি না। পিঠের উপর বর্ষাতি ফেলে আজও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি; ঝিরিঝিরি হাওয়া, ফুলের মতো ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি; নীল, কালো, ধোঁয়ারঙের মেঘ আকাশ ভ'রে ছড়িয়ে আছে।

আমার আপিশ শহরের বাইরে; বাস্-এ যেতে-যেতে দেখতে পাই অনেক গাছপালা, ডোবা, ড্রেন, ঘাসের জমি, বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে বেঁকে-যাওয়া মস্ত বড়ো আকাশ। এই সবই সুন্দর হ'য়ে ওঠে বর্ষাকালে, আশ্চর্য ব'লে মনে হয়; প্রতি বছর আষাঢ় শ্রাবণে আমি বাইরে তাকিয়ে ভিড়ের কষ্ট ভুলে যাই; চেনা দৃশ্য কখনো যেন পুরোনো হয় না। প্রতি বর্ষায় কখনো-না-কখনো এমন হয় যে, একটানা প্রায় পনেরো দিন ধ'রে আকাশ মেঘলা হ'য়ে থাকে; বৃষ্টি মাঝে-মাঝে থেমে ট্যারচা হ'য়ে নেমে আসে আবার; সেই দিনগুলো আমার কাছে যে কত সুখের, সে-কথা কাকে বোঝাবো। একটা মোড়ে এসে বাস কিছুক্ষণ দাঁড়ায়; সেখানে মস্ত ছড়ানো মাঠ জুড়ে এক ধোপাখোলা এখনো টিকে আছে; শাদা রঙিন ধুতি শাড়ি প্যান্ট পাজামায় ছবির মতো হ'য়ে থাকে সব সময়; তিন দিনের বৃষ্টির পরে মাঠের বদলে হ্রদ হ'য়ে যায় জায়গাটি, মেলে-দেওয়া কাপড়-জামাগুলো বর্ষার নিশেনের মতো উড়তে থাকে। ধোপাখোলা পেরিয়ে এক নতুন বসতির আরম্ভ; তৈরি-হওয়া বা

তৈরি-হ'তে-থাকা বাড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখতে পাই ছিপছিপে সুপুরি গাছের কান্তি—কোনো-কোনোটি মাটি ফুঁড়ে বাঁকা হ'য়ে উঠেছে, ভঙ্গিটা এতদূর পর্যন্ত হেলানো যে অবাক লাগে যে প'ড়ে যাচ্ছে না।

প্রতি বছর ছুই চোখ ভ'রে এইসব দেখি আমি; দেখে-দেখে তৃষ্ণা মেটে না। স্নিগ্ধ আকাশ, আদরের মতো হাওয়া, জলের উপরে বৃষ্টি পড়ার তারাবাজি, আর মাটিতে এই বিচিত্র সবুজ—অনেক ভিন্ন-ভিন্ন রঙের সবুজ যেন—সব মিলে আমার কাজের ঘণ্টাগুলোকে আবেশে ভ'রে তোলে। আজ হঠাৎ আমার মনে হ'লো: কেন? এই বর্ষা, বাংলার এই বর্ষা ঋতু—এত ভালোবাসি কেন? সঙ্গে-সঙ্গে মনের মধ্যে উত্তর পেলাম: তাঁর কাছে শিখেছি। যদি না ছেলেবেলা থেকে 'গল্পগুচ্ছ' পড়তাম, যদি না দিনে-দিনে অনবরত তাঁর গান আর গানের সুর আমার রক্তের মধ্যে মিশে যেতো, তাহ'লে এই ভালোবাসা আমার এই পঞ্চাশ বছরকেও এমন ক'রে কাঁপিয়ে দিতে পারতো না আজ। সেই প্রায় অজ্ঞান বয়সে যে-মন্ত্র তিনি কানে দিয়েছিলেন, আজও কি তা ভুলতে পেরেছি? নাকি কোনোদিন পারবো? তাঁরই হাত থেকে পেয়েছি আমি বাংলাদেশকে—শুধু আমি নই, লক্ষ-লক্ষ বাঙালি তা-ই পেয়েছে; এই মেঘ, বৃষ্টি, আকাশ, এই গাছপালার সবুজ—এ-সবের নিজের মধ্যে সুন্দর বা অসুন্দর কিছু নেই; তিনিই তাঁর সুরে ছন্দে ভাষার জাদুতে জড়িয়ে-জড়িয়ে এদের সুন্দর ক'রে রেখে গেছেন—আমাদের জন্য—চিরকালের মতো।

কয়েক বছর আগে একবার বিদেশে ছিলাম। কনকনে শীতের রাত্রে একলা ঘরে ব'সে-ব'সে হঠাৎ আমার মনে পড়লো সেই কবিতাটি—'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে। এই

ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' যেন এই প্রথমবার কবিতাটিকে আবিষ্কার করলাম, বুঝতে পারলাম কী-কথা ওতে বলা হয়েছে। তারপর মনে পড়লো 'জন-গণ-মন' গান; মনে পড়লো 'কথা ও কাহিনী,' 'কাহিনী'—কতকাল ধ'রে প'ড়ে আসছি ও-সব, কিন্তু ও-সবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের যে-মূর্তিটিকে তিনি ধরেছিলেন, তা এতদিন পরে চমকে উঠে আমি দেখতে পেলাম—বিদেশে, ঠাণ্ডা ঘরে, একলা রাত্তিরে ব'সে-ব'সে। ছন্দে, রূপে, রসে আবহমান ভারতবর্ষ ঐ কবিতাগুচ্ছে যেন হিল্লোলিত; তার ভূগোল, তার ইতিহাস, বাস্তব তথ্য, নদী পর্বত অরণ্য, উপনিষদের যুগ, কালিদাসের যুগ, পাঠান মোগল শিখ, কবীর সুরদাস, বৈষ্ণব কবিতা —লুপ্ত শতাব্দীগুলো একে-একে বেঁচে উঠলো আবার, পরস্পরে মিশে গিয়ে এক বিরাট হৃৎপিণ্ডের মতো স্পন্দিত হ'তে লাগলো। কী আছে ও-সব কবিতায় যার জন্যে এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'লো, যা ভূগোল ইতিহাস জ্ঞানের বইতে কখনোই পাওয়া যায় না? আছে ভালোবাসা, আছে ধ্যান, আছে কল্পনা। আমরা ভারতবর্ষকে ভুলে গিয়েছিলাম; তিনি তাকে উপার্জন ক'রে ফিরিয়ে আনলেন, দিয়ে গেলেন আমাদের হাতে—চিরকালের মতো।

জাহাজে চলেছিলাম পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। অকূল আটলান্টিক; পাঁচদিন ধ'রে অসীম জল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। সেই জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে হ'তো যে এই যে আমরা পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণে পৃথিবীটাকে ভাগ করেছি, এরও পিছনে আমাদের কল্পনা কাজ করছে; অবস্থার বদল হ'লে পুবে পশ্চিমেও অনবরত বদল হ'য়ে যায়; এই যেমন আমরা ভারতে ব'সে য়োরোপকে পশ্চিম বলি, কিন্তু আমেরিকার কাছে সেটাই প্রাচী, আবার পশ্চিমতম আমেরিকা থেকে আরো পশ্চিমে সাগরপাড়ি

দিলে আমরা পৃথিবীর পূর্বতম দেশ জাপানে গিয়ে পৌঁছবো। এতে যেমন একদিক থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে পৃথিবীটা গোল, তেমনি কি এও প্রমাণ হচ্ছে না যে পৃথিবীটা এক? মাটি অথবা জলের অণুতে-অণুতে যুক্ত হ'য়ে আছে দেশের সঙ্গে দেশ, মহাদেশের সঙ্গে মহাদেশ; যে-কোনো দিকে বেশিদিন ভ্রমণ করলে আমরা উল্টো-দিকে পৌঁছবো; তাহ'লে যে-কোনো মানুষের পক্ষেই পুরো পৃথিবীটাকে 'আমার' ব'লে না ভেবে উপায় কী। এমনি অনেক কথা ভেবেছিলাম জাহাজে যেতে-যেতে, আর ভেবেছিলাম সেই কবির কথা, যিনি এমনি ক'রে ডেক-এ দাঁড়িয়ে অনেকবার সমুদ্র দেখেছিলেন, লিখেছিলেন কেবিনে ব'সে পাতার পর পাতা ডায়েরি, জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন যিনি। সেই নিমন্ত্রণ চিরকাল ধ'রে উচ্চারিত হচ্ছে, সেটা নতুন নয়; নতুন সেই কবি, যিনি শুনতে পেয়েছিলেন সেই আহ্বান, তাতে সাড়া দিতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা অথবা কার্পণ্য করেন নি। তিনিই আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন এই পৃথিবী—তাঁর আগে তাকে আমরা জানতুম না; এমন দিন কখনো যেন না আসে যখন আমরা সেই পৃথিবীকে—এই পৃথিবীকে—ভুলে যাই। আমরা বাঙালি, আমরা ভারতবর্ষীয়, আমরা পৃথিবীর অধিবাসী—তাঁর পৌরোহিত্যে আমাদের এই তিন সত্তায় মিলন হোক।

রবীন্দ্র-স্মৃতি

সুখলতা রাও

একশো বছর আগে যিনি এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন, আজ তাঁর তিরোধানের পরেও জাতি তাঁকে স্মরণ করছে, তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে অশেষভাবে সমৃদ্ধ করে গেছে, জগতের কাছে ভারতের গৌরব বাড়িয়ে গেছে। কিন্তু শুধু এই জন্য যে তিনি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন তা নয়। তাঁর যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যে প্রজ্ঞাউজ্জ্বল পুণ্য আত্মা এই সাহিত্য সাধনায় প্রকাশ পেয়েছে সেই আত্মাকেই আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

কত কবিতা, কত গান, কত অমূল্য বাণী, অজস্র ধারায় ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি দেশের আকাশে বাতাসে। সেই সকল রচনাই তাঁর দেশের জনগণের মনকে সুখে দিয়েছে দোলা, দিয়েছে অধিকতর আনন্দ, দুঃখে দিয়েছে আশ্বাস ও সান্ত্বনা, দিয়েছে অভয়, সংগ্রামে দিয়েছে বল ও সাহস। যে স্বাধীনতা পেয়ে ভারতবর্ষ আজ কৃতার্থ, সেই স্বাধীনতা লাভের মূলে রবীন্দ্রনাথের দান কতখানি তা সহজে ধারণা করবার নয়। যাঁরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও তার পরের রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেছেন, তাঁরা জানেন কি অপরাজেয় উৎসাহ, কি আত্মিক বল এনেছিল রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতগুলি। সে সকল সঙ্গীতে দেশবাসীর হৃদয়ে যেমন দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়েছিল, যেমন পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার এনেছিল মনে তেমনি মুক্তি ও স্বাধীনতার, আশার আনন্দের বারতা, ব্যাকুলতা এনে দিয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ যখন

ইংরাজ প্রদত্ত নাইটহুড্ ত্যাগ করেছিলেন, দেশবাসী স্তম্ভিত, চমৎকৃত হয়েছিল তাঁর দেশাত্মবোধ ও পৌরুষ দেখে।

গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি নিভৃতে কিম্বা বন্ধুজনের সঙ্গে বসে পড়বার ও রসগ্রহণ করবার জিনিষ। কবিতার সুন্দর আবৃত্তি উপভোগ করতে পারেন সকলেই। কিন্তু সঙ্গীত যেন আরও উচ্চস্তরের বস্তু যা মানুষের মনকে আপন ভাবে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই জন্য মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, মহামূল্য রত্ন। শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি বলেই না কি তাঁর মাহাত্ম্য। তিনি আগে কবি, তারপরে ধর্মোপদেষ্টা বা অন্য কিছু। বিশ্বকবির প্রতিভার পরিমাপ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু কবিত্বই যদি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হত তাহলে তিনি বিশ্বের দরবারে এত সমাদর লাভ করতে পারতেন কিনা জানি না। তাঁর নিজের অনুদিত 'গীতাঞ্জলি' বইয়ে মূল বাংলা কবিতার ধ্বনি ও ছন্দ মাধুর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কাব্যের গভীরতা অক্ষুন্ন আছে। শব্দ বিন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত মহাপ্রাণের বাণী আপন মহিমায় বিদেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে।

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। আমার ভাই সুকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার শেষ অসুখের সময় আমাদের বাড়িতে এসে তার বিছানার পাশে বসে গান শোনাতেন, নতুন নতুন রচনা পাঠ করতেন। তাঁর তিরোধানের কিছু আগে আমি, আমার স্বামী ও বোন পুণ্যলতা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। বৈশাখী উৎসবের পর আমরা শ্যামলী-ভবনে গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে। তিনি আঙ্গিনায় বসে ছিলেন

আরাম কেদারায়। কিছু ক্লান্তভাবে। একটি ফুলের গাছ তার পত্রবিরল শাখাপ্রশাখা মেলে দিয়েছিল কবির মাথার উপর দিয়ে। শাখাগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা ফুলের স্তবক। আর সেই ফুলের পিছনে আলোভরা আকাশে দেখা যাচ্ছিল চাঁদ। তিনি চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসেছিলেন। তাঁর কাছে রসে গভীর পরমার্থিক বিষয়ে কিছু শুনলাম। অঝোর জ্যোৎস্নাধারা ধৌত সেই শুভ্র ধ্যানমূর্তি আমার স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।...

আজও মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নাধবল রাত্রি আমাকে উন্মনা করে। যেন দেখতে পাই সেই শুভ্র ধ্যানমূর্তিটিকে।

কবির গল্প

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

আনন্দমেলার রবীন্দ্র সংখ্যায় কবির গল্প বলবার জন্যে এমন এক বন্ধুর কাছ থেকে ফরমাস এসেছে, যাকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। অথচ কোন দিনই আমার কিছু লেখা অভ্যাস নেই বলে লিখবার সংকোচও কম নয়, বিশেষত ছোটদের ভাললাগার মতো করে বলতে পারা আরো কঠিন। তবু চেষ্টা করবো কবির কোনো একটা বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তুলতে, যার ছবি আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

সকলেই জানে তিনি খুব বড় কবি, অনেক বই লিখেছেন, বাংলাদেশে গানের নদী বইয়ে দিয়েছেন, শুধু গানের কথা নয়, সুরও তাঁর নিজেরই রচনা, যার বৈশিষ্ট্যকে কেউই হার মানাতে পারে নি, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরিজি তর্জমার জন্যে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, ইত্যাদি আরো কত কি। কিন্তু কম লোকেই জানে তিনি কি রকম পশু-পক্ষী গাছপালা ভালবাসতেন। আমি সেই কথা আজ একটু বলবার চেষ্টা করবো। বেশী কিছু নয়, দু' একটা ছবি, যা দিয়ে বোঝা যাবে ওঁর স্বভাবের এই দিকটা।

কবি নিজে কখনও খাঁচার ভিতর পাখী কিংবা বাড়িতে জন্তু পুষতে ভালবাসতেন না। শান্তিনিকেতনে ভোরবেলা নিজে যখন বাগানের ভিতর অথবা বাড়ির সামনে খোলা চাতালে চা খেতে বসতেন, তখন ওঁর চারপাশে পাখীদেরও একটা ভোজ সুরু হতো। নিজে বেশীরভাগ সময়ই হয় মুড়ি নয় কল বেরোনো ভিজে মুগ বা ছোলা খেতেন,

সামান্য একটু আদার কুচি কি গুড় দিয়ে। রুটি মাখনও খাওয়া চলতো। মুড়িটার আমদানী বোধহয় বিশেষ করে পাখিদের জন্যেই। কবির টেবিলের একটু দূরে যতরাজ্যের শালিখ, চড়াই, পায়রা ইত্যাদি এসে ঘোরাফেরা সুরু করলেই, তিনি তাদের দিকে মুঠি মুঠি মুড়ি ছড়িয়ে দিতেন আর তারা নেচে নেচে এসে তাই খুঁটে খুঁটে তুলে নিতো। এদের মধ্যে আবার কাকেরও আমদানী হতো। কবি বলতেন, "কাকগুলোকে আমার দেখতে ভাল লাগে না ; তবু মনে ভাবি দেখতে যেমনই হোক, বেচারাদেরও তো কিছু দাবি আছে এই ভোজের সভায়, তাই আর তাড়া দিতে ইচ্ছে করেনা।"

বাড়ীর পোষা পাখির মধ্যে দুটো ময়ুর ছিল। সকালবেলা খানিকটা সময় তারা খাঁচা থেকে ছাড়া পেতো। তাদের মধ্যে একটা ময়ুরের কাণ্ড দেখে কতদিন হেসেছি! সে বাগানে ঘুরে ফিরে বেড়াবার সময় যেই দূরে কোনো চাকরকে দেখতো অম্নি তার ভয় হতো এই বুঝি তাকে আবার খাঁচায় পুরে দেবে। বেচারা ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে ঠিক কবির চেয়ারের পিছনের দিকে একটা বাঁধানো উঁচু জায়গায় এসে আশ্রয় নিতো এবং তারপর খুব নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে চাকরটার দিকে চেয়ে থাকতো। ভাবখানা এই যে "ধরো দেখি এবার কেমন ধরবে?" সে যেন কি করে টের পেয়েছিল যে এই ধবধবে সাদা সৌম্যমূর্তি মানুষটির চেয়ারের পিছনটাই তার পক্ষে একমাত্র নিরাপদ জায়গা। কারণ চাকররা ময়ূরের কাছে এলেই কবি বলতেন, "রেহাই দে বাবু তোরা পাখিটাকে, ও কেমন নিজের মনে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আমার দেখতে ভালো লাগে। কেন তোরা বেচারাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াস?" একদিন এই রকম অবস্থায় কবি হেসে আমাকে বললেন, "একটা মজা দেখবে? ঐ চাকরটাকে যতক্ষণ এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবো, ততক্ষণ ময়ূরটা

আমার পিছন থেকে নড়বে না।”

তখন শীতকাল। কবি অনেকক্ষণ বাইরে বসে নিজের কাজ করতেন; তারপর স্নানের সময় হলে বাইরের সভা ভঙ্গ হতো। সেদিন চাকরটাকে হুকুম দেওয়া হল যেন সে ওখান থেকে শীগ্‌গির না যায়। পাখিটাও তেমনি ঠায়ে চুপ্‌চাপ বসে রইল। আমি তা দেখে হেসে অস্থির। কবি বললেন “এই অবোধ জীবগুলো কেমন ক'রে যেন টের পায় যে আমার দ্বারা তাদের কোনো অনিষ্ট হবে না, তাই এমন নির্ভয়ে আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করে।”

পাখিদের যে রোজ সকালে খেতে দিতেন, সেটা কোনো চাকরকে দিয়ে নয়। নিজে হাতে মুড়ি ছড়িয়ে, জলের সরাতে জল ঢেলে তবে ওঁর তৃপ্তি। এই মাটির সরাটা কাছেই থাকতো। সর্বদা তাতে জল ভরা আছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি। ওঁর পুরোনো চাকর বনমালীও জানতো “বাবামশাই” অত্যন্ত বিরক্ত হবেন যদি এসব বিষয়ে কোনো অবহেলা ঘটে। বলতেন, “সকালবেলা আমার অন্নসত্র বসেছে। চেয়ে চেয়ে দেখি আর ওদের এই সহজ আনন্দ দেখে খুসীতে মন ভরে ওঠে।”

একটা লাল রঙের রাস্তার কুকুর ওঁর কাছে এসে জুটেছিল। তার নাম রেখেছিলেন, “লালু”। সে কারো পোষা কুকুর নয়, কাজেই দৈনিক খাবারের বরাদ্দ সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারতো না। কিন্তু যেদিন থেকে কবিকে পেল, সেদিন থেকে সে বেঁচে গেল। রোজ সকালে চায়ের টেবিলে দু' শ্লাইস পাঁউরুটি টাট্‌কা মাখন দিয়ে টোস্ট করা থাকতো। কবি যতক্ষণ খেতেন ততক্ষণ লালু দূরে টেবিলের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতো—যেন তার মন দিয়ে রাস্তা দেখা ছাড়া এখানে আসবার আর কোনোই উদ্দেশ্য নেই। কবি আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলতেন,

"দেখেছো? কতো সভ্য কুকুর আমার। ওর কোনোরকম হ্যাংলামি নেই। ধৈর্য ধরে চুপ করে আমার ডাকের অপেক্ষায় থাকে; তারপর খাওয়ার শেষে যখন লালু বলে ডাক দিই, তখন পাশে এসে বসে মুখের দিকে চোখ তুলে চায় আর আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়ে এই রুটিটুকু শান্ত ভাবে খেয়ে আবার ধীরে ধীরে চলে যায়। কোনো রকম ছিব্‌লেমো নেই, কাড়াকাড়ি নেই, মুখে এতটুকু ডাক পর্যন্ত নেই—একেবারে নিঃশব্দ গম্ভীর। একেই বলে আসল আভিজাত্য। সেই জন্যেইতো আমি ওকে এত ভালবাসি।"

বনমালী দাঁড়িয়ে খেতে দিচ্ছিলো হেসে বললো—"কিন্তু এমন ওর অভিমান যে, যদি কেউ একটু বকে বা হ্যাংলা বলে অমনি আস্তে আস্তে খাবার ফেলেই চলে যায়।" কবি বললেন, "ওকি আমার যে সে কুকুর, যে একটু খাবারের লোভে অপমান সহ্য করবে? এই হল আসল অভিজাত্য। নাই বা হল ওর পাঁচশো টাকা দাম।"

বনমালীর কথাটা পরীক্ষা করবার জন্যে কে যেন একটু খেঁকিয়ে বলে উঠলো, "লালু ঠিক সকালবেলা খাবার লোভে এসে বসে আছে তো? আচ্ছা হ্যাংলা কুকুর জুটেছে দেখ্‌ছি"; তখনি লালু কোনোদিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। সেদিন দুপুরের খাবার সময়ও লালুকে আর দেখা গেল না। কবির মহাদুঃখ যে শুধু শুধু কুকুরটাকে সেদিন অমন করে কষ্ট দেওয়া হল। পরদিন ভোরবেলা উনি একটু বিশেষভাবেই ওকে কাছে ডেকে মাথা চাপড়ে আদর করলেন। যখন দেখলেন লালুর আবার স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরে এসেছে তখন নিশ্চিন্ত। লালু যে বিনা দোষে মনে কষ্ট পেয়েছিল এ বেদনা ওঁর মন থেকে যেতে সত্যিই সময়

লাগলো। অথচ কুকুর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা বা ওদের সঙ্গে আহুরেপনা করা কবির মোটেই স্বভাব ছিল না। লালু তাঁর আদর পাবার জন্যে চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালে, তার মাথায় একটু হাত দিতেন, তাতেই সে খুসি হয়ে চলে যেতো।

ক'লকাতায় কবি এসে যখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন, তখন আমাদের পোষা কুকুরটা কোনো দুষ্টুমি করেই ওঁর পায়ের কাছে কিম্বা চেয়ারের নীচে আশ্রয় নিতো। জানে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে কেউ শাস্তি দিতে পারবে না। আমি গিয়ে ওঁকে সেকথা বললে একটু হাসতেন আর বলতেন, "আহা, বেচারা কথা বলতে পারে না, ওকে শাস্তি দিয়ে লাভ কি? ছাখো, কি রকম ভয় পেয়েছে।" আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম, কুকুরটা আমাদের জন্যে যে ছট্‌ফট্‌ করছে কাজের মধ্যে মগ্ন থাকলেও এটা তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। ফিরে এলে তিরস্কার করে বলতেন, "কেন তোমরা জানোয়ার পুষে এরকম কষ্ট দাও? তোমরা চলে যাওয়া অবধি ও কি রকম কষ্ট পাচ্ছিলো; কথা বলতে পারে না, ভাবে তোমরা বুঝি ওকে একেবারেই ত্যাগ করে চলে গেলে। তাই থেকে থেকে আমার কাছে এসে মুখের দিকে তাকায়, আবার চলে যায়। তারপর আবার বারান্দার রেলিং এর ভিতর মুখ গুঁজে দিয়ে পথের দিকে চেয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। কোনো জানোয়ারকে এরকম কষ্ট পেতে দেখলে আমার ভারি খারাপ লাগে, কারণ ওদের কোনো রকম সান্ত্বনা দিতে পারিনে, অথচ কষ্ট পাচ্ছে বুঝতে পারি।" আমি বলতাম, "কিন্তু সব জায়গায়ই তো কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় না।" বলতেন, "তাহলে পোষো কেন?" এর কি জবাব দেবো?

কবির মত ছিল যে খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলে মেয়েদের

বাগান করতে শেখানো উচিত। যাদের বাড়ীতে জমি নেই, তাদের অন্ততঃ টবেও তুচারটে গাছ লাগিয়ে বাড়ীর ছোটোদের সেই গাছ পালন করবার ভার দেওয়া উচিত। বলতেন, "এতে করে শিশুদের মন অনেক বেশী সজাগ হয়ে ওঠে। একটা দায়িত্ববোধ হয়, যে গাছগুলোর বাঁচা মরা আমারই উপর নির্ভর করছে, তাই নিয়ম করে জল দেয়, যত্ন করতে শেখে। অথচ এটা একটা কঠোর দায়িত্ব পালনের চেয়ে খেলা বলেই অনুভব করে, কাজেই এটাতে তাদের খুব আনন্দ। ছোটো থেকে গাছপালাকে এরকম করে ভালবাসতে শিখলে মনটা খুব সজাগ হয়ে ওঠে, নিজেরাই লক্ষ্য করতে শেখে কোন্ গাছের কি বৈশিষ্ট্য। নতুন পাতা বেরোবার আগে ডাল-গুলোতে কি পরিবর্তন হয়, কুঁড়ি বেরোবার আগে ডালের ডগাটা কি রকম হয়, সব তারা নিজেই শিখে ফেলে। তারপর মাষ্টার-মশাইয়ের কাছে কিম্বা ইস্কুলে পড়ার বইতে যখন সে সব জিনিষের উল্লেখ ছ্যাখে তখন সে কী আনন্দ। কারণ তার আগেই সে নিজে নিজে সেসবগুলো শিখে ফেলেছে। তাছাড়া সেই বই সম্বন্ধেও তার আগ্রহ বেশী হয়, পাঠ মুখস্থ করতে তখন আর দেরী লাগে না। ছোটো থেকে গাছপালা ভালবাসতে শিখলে বড় হয়েও পারিপার্শ্বিক জিনিষ সম্বন্ধে মনটা অসাড় থাকে না, সব জিনিষই লক্ষ্য করে দেখতে শেখে, প্রকৃতির মধ্যেও কতো বৈচিত্র্য তা অনুভব করে আনন্দ পায়, মনটা অনেক সুকুমার হয়ে ওঠে। কোনো একটা জীবন্ত জিনিষের প্রতি এইরকম করে মনের আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগিয়ে তোলা শিশুদের পক্ষে বিশেষ দরকার।"

তিনি নিজে তাঁর বাগানের কত গাছের নামকরণ করেছিলেন যার নাম কারো জানা ছিল না। নীলমণিলতা, সোনাঝুরি, হিমঝুরি, বনপুলক প্রভৃতি তাঁর নিজের রচনা। তাঁর ঘরের সামনে

একটা নীলমণিলতা লাগিয়েছিলেন। এই লতাটার ইংরিজি নাম পেট্রিয়া। এই লতাটি উনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। যখন ঘন নীল ফুল স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠে গাছটিকে ঢেকে ফেলতো, তখন সে সত্যিই একটা দেখবার জিনিষ—বিশেষ করে কবির পক্ষে আরো। কারণ তিনি নীল রঙ-এর বড় ভক্ত ছিলেন। বলতেন, "সব রঙের মধ্যে নীলরঙটাই আমার মনকে বেশী করে নাড়া দেয়।"

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে উনি রঙকানা ছিলেন। লাল রঙটা বেশী চোখে পড়তো না, মানে লাল আর সবুজের বেশি পার্থক্য বুঝতে পারতেন না। কিন্তু কোনো জায়গায় নীলের একটু আভাসমাত্র থাকলেও সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। বাগানে ঘাসের মধ্যেও খুব ছোট নীল রঙের জংলী ফুল ফুটে থাকলে ঠিক ওঁর চোখে পড়তো, বলতেন, "ছাখো, ছাখো, কী চমৎকার ফুলটা।" অথচ আমরা হয়তো খুব লক্ষ্য করেও ফুলটি খুঁজে বের করতে মুস্কিলে পড়তাম। হাসতেন আর বলতেন, "কী আশ্চর্য! এত স্পষ্ট জিনিসটা দেখতে পাচ্ছো না? অথচ আমি তোমার লাল ফুল ভালো দেখতে পাইনে বলে আমাকে ঠাট্টা করো। নীল রঙটা যে পৃথিবীর রঙ, আকাশের শান্তির রঙ, তাই ওটার মধ্যে আমার চোখ ডুবে যায়, আর লাল রঙটা হল রক্তের রঙ, আগুনের রঙ অতএব প্রলয়ের রঙ, মৃত্যুর রঙ, কাজেই বেশী না দেখতে পেলে দোষ কি?"

সেই নীলমণিলতার প্রতি ওঁর বেজায় দরদ ছিল। গাছটির শৈশব অবস্থায় রোজ নিজে হাতে জল দিতে দেখেছি। বড় হয়ে যাবার পর অবিশ্যি এটার আর দরকার হতো না। শুধু জল দিতেন না, ফুলদানীর সমস্ত বাসিফুল এই গাছটির গোড়ায় ঢেলে দিতেন। বলতেন, "এই ফুলগুলো এইখানেই পচে মাটি হয়ে গিয়ে ওর খাদ্য

জোগাবে।" ফুল যখন ফুটতো তখন সবাইকে ডেকে বলতেন, "ছ্যাখো, কী চমৎকার দেখাচ্ছে।"

আমার লাল রঙ বেশী পছন্দ বলে আমাকে কত সময় নীলমণিলতা ফুলের গুচ্ছের দিকে দেখিয়ে ঠাট্টা করে বলেছেন, "কি, এখনও তুমি লাল রঙ বেশী ভালো বলবে?" আমিও ঠাট্টা করে উত্তর দিয়েছি, "তাই যদি না হবে তাহলে আপনি পলাশ এত ভালবাসেন কেন?" উত্তরে বলে উঠতেন, "ঐ ছ্যাখো, আবার তর্ক শুরু হল। আরে, পলাশটা কি শুধুই লাল? ওতে কতখানি হল্‌দে মেশানো রয়েছে, তাছাড়া ঘোর সবুজ—প্রায় কালো একটা রঙ আছে, এই দুই মিলিয়ে তবে তো পলাশের বাহার? তাছাড়া পলাশের গড়নটার কথাও তো ভুললে চলবে না।" এই রকম কত ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলতো মজা করে।

ছোটো ছেলেমেয়েদের প্রতি কবির অত্যন্ত স্নেহ ছিল। জানা অজানা কতজন যে তাঁকে "দাদুমণি", "দাদামশাই" বলে চিঠি লিখতো তার ঠিক নেই, এবং প্রায় সব সময়েই উনি তার উত্তর দিতেন আর বেশ মজা করেই উত্তর দিতেন। "ভানুসিংহের পত্রাবলী" বইখানাতে তার নমুনা পাওয়া যায়। শুনেছি একবার একটি ছোটো মেয়ে ওঁর "ঘরে বাইরে" বই-এর নিখিলেশের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখে যে গুলি খেয়ে নিখিলেশ বাঁচলো কি মরলো আমাকে শীগগির জানাবেন। আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তার কি হল শেষকালে। কবির কাছে মেয়েটি পরিচিত ছিল না। তবু তৎক্ষণাৎ উত্তরে লিখলেন, "নিখিলেশের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তেমন বড় ডাক্তার, যেমন নীলরতন সরকারকে দিয়ে চিকিৎসা করালে হয়তো

বাঁচতে পারে।" মনে রাখা দরকার এইসব চিঠি যখন লিখতেন, তখন হয়ত তাঁর হাজার রকম কাজ ঘাড়ে রয়েছে, এবং সারাদিন ধরে সেইসব কাজের দাবী মেটাতে হচ্ছে। শুধু এইরকম সব অত্যন্ত অবান্তর চিঠিরও জবাব না দিয়ে থাকতে পারতেন না। একেবারে শেষে যখন শরীর আর চলে না, তখন নিজেহাতে চিঠি লেখা প্রায় বন্ধ করেছিলেন। তাও সেক্রেটারিদের খোঁচা দিতেন কবির হয়ে চিঠির জবাব দিয়ে দিতে তারা যেন গাফিলি না করে।

বুধবার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছুটির দিন। সেদিন সকাল-বেলা শিশু-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কবির সঙ্গে দেখা করতে আসতো। তিনি আগে থেকেই তাদের জন্য কাঁচের বোতলে হয় লজেন্‌স্ নয় টফি কিম্বা চকোলেট সংগ্রহ করে তৈরী হয়ে বসে থাকতেন। তারা এসে প্রণাম করলেই চাকর বা যে কেউ থাকতো বলতেন বোতলটা এগিয়ে দিতে এবং নিজেই সকলের হাতে হাতে সেই সব মিষ্টি ভাগ করে দিতেন। লজেন্‌সের বোতল দেখবামাত্র শিশুদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সকলের হাতে মিষ্টি দিয়ে কারো গাল টিপে, কারো মাথা ঝাঁকিয়ে আদর করে বলতেন, "এইজন্যেই আমাকে দেখতে আসার এত উৎসাহ, নারে?" তারা হাসতে হাসতে চলে যেতো! আমাদের দিকে চেয়ে বলতেন, "ওদের হাসিমুখ দেখতে আমার বড্ড ভালো লাগে। তাইতো এত আয়োজন করে রাখি।"

লজেন্‌স্ বিতরণ সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ ছিলেন যে যখনি যে কোনো ছোটো ছেলে ওঁর ঘরে আসতো, তখনই সেই বোতলটা সামনে খুলে ধরতেন। নতুন কেউ হলে সে বেচারা একটু লজ্জিত-ভাবে চুপ করে থাকতো প্রথমটা, কিন্তু লোভে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠছে দেখে কবি হেসে বলতেন, "নে না হাত ঢুকিয়ে—যতটা

ইচ্ছে মুঠো করে তুলে নে। লজ্জা কি এতে ?” তখন আর চুপ করে থাকার দরকার নেই। ছোট হাতখানি আস্তে আস্তে বোতলের মধ্যে ঢুকে যেতো, বৃদ্ধ সকৌতুকে হাসতেন। কতদিন আমাকে বলেছেন, “ছেলেমেয়েগুলোকে আমার ভারি ভালো লাগে। যখন বয়স কম ছিল, ওদেরই মাঝখানে আমি থাকতুম। কত খেলা ওদের নিয়ে খেলেছি, পড়ানোটাও প্রায় খেলারই মতো করে পড়াতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম ; চব্বিশঘণ্টাই ওদের নিয়ে আমার কেটেছে। এখন এই রকম শরীর জীর্ণহওয়ায় বাধ্য হয়ে ওদের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে আসতে হয়েছে। তাই ছুটির দিনে সকালবেলায় ওরা যখন মৌমাছির ঝাঁকের মতো মধুর লোভে আমার ঘরে এসে হাজির হয়, আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে ; এক একটা ছেলের কি রকম দুষ্টু দুষ্টু মুখ, এক একজনের কি রকম বড় বড় ফ্যালফেলে চোখ আর ভালমানুষ চেহারা—কতরকমের বৈচিত্র্য ওদের মধ্যে ; দেখতে ভারি ভালো লাগে। ওদের দেখি আর আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ইস্কুল যাওয়াটা আমার পক্ষে কী নিদারুণ দুঃখের ব্যাপারই না ছিল। সেই নর্ম্যাল স্কুলের দিনগুলো যেন আমার একটা দুঃস্বপ্ন। এই ছোট ছেলেদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যেই তো শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সূচনা, যাতে ওদের দিনগুলে খুশিতে আনন্দে ভরে থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোও শিখতে পারে। আমার নিজের নিরানন্দ ইস্কুলের দিনগুলো মনে করেই এদের আনন্দ দেবার জন্যে এত আয়োজন এখানে করেছিলুম। কত রকম খেলা, কতরকম নাটক ওদের জন্যে রচনা করেছি, গান বেঁধেছি, অভিনয় শিখিয়েছি সবই আমার সেই শৈশবকে স্মরণ করে। এখানে কোনো কোনো অধ্যাপক কখনও কখনও আপত্তি তুলেছেন ওদের বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে,

কিন্তু আমি তাঁদের নিরস্ত করেছি। কারণ জানি, শিশুকালে আনন্দের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠবার বিশেষ মূল্য আছে।"

বিদেশের একদিনের একটা ছবি মনে পড়লো। ইতালীতে ১৯২৬ সালে কবি গিয়েছিলেন যখন, তখন ট্যুরিন্ সহরে হোটেলে একজন অতি গরীব ইতালীয় ভদ্রলোক তাঁর ৫।৬ বছরের শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি অতি সংকুচিত হয়ে এসেছিলেন অতবড় একজন লোককে বিরক্ত করা হবে মনে করে। কিন্তু তাঁর ছেলেটি বাবাকে অত্যন্ত বিরক্ত করছিল কবিকে দেখবে বলে। দুজনেরই অত্যন্ত দরিদ্র পোষাক, হোটেলে কবির ঘরের দরজায় অতি ভয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি চান। ভদ্রলোক খুব ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে এবং অনেকখানি ইসারাতে আমাকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের আসবার উদ্দেশ্যটা।

আমি জানতাম এ রকম কোনো লোককে কবি কখনও ফেরান না, বিশেষ করে শিশুদের। কাজেই তাঁদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে কবিকে বললাম এই ভদ্রলোকের কথা। কবি শুনেই লেখবার টেবিল ছেড়ে উঠে এসে সোফায় তাঁদের নিয়ে বসলেন, ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। সে তো এত অভিভূত যে প্রায় উচ্চারণ করতে পারে না নিজের নাম। কবি তার গাল টিপে মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন—তার বাবার চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে এল। তিনি কবির একখানা বই, যা ইতালীয়ানে তর্জমা হয়েছে, কিনে নিয়ে এসেছিলেন কবিকে দিয়ে সই করাবেন বলে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুসী হয়ে নিজের নাম বই-এর পাতায় সই করে দিলেন।

ট্যুরিনের সবচেয়ে বড়ো চকোলেট ফ্যাক্টরীর মালিকরা রবীন্দ্র-নাথের জন্যই বিশেষ করে সাজিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা চকোলেটের

বাক্স তার আগের দিন উপহার পাঠিয়েছিল। ভদ্রলোকটি চলে যাবার সময় কবি সেই চওড়া রেশমের ফিতে দিয়ে বাঁধা বাক্সটি ছেলেটির হাতে দিলেন। সে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে না যে এই চওড়া ফিতে দিয়ে বাঁধা ঝক্‌ঝকে লোভনীয় চকোলেটের বাক্সটি তারই নিজের সম্পত্তি। তার জীবনে এতগুলো চকোলেট একসঙ্গে বোধহয় সে আর কখনও পায়নি। শিশুপুত্রের হাত ধরে ভদ্রলোক চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কবিকে ধন্যবাদ দেবারও ভাষা খুঁজে পেলেন না।

রবীন্দ্রনাথ

অজিত দত্ত

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিরাট ও বহুমুখী একথা আমরা জানি, কিন্তু সে যে কত বড় তা পরিমাপ করতেও অসামান্য প্রতিভা ও সুদীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। আজকের দিনে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই রবীন্দ্রপ্রতিভার ছোট্ট একটি অংশমাত্র আত্মস্থ করতে পেরেছি, তার প্রমাণ কবিরা তাঁকে কবিগুরু বলে জানেন, কথা-সাহিত্যিক জানেন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক বলে, চিত্রকর তাঁর ছবিকে প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি বলে মনে করেন, ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ অকুণ্ঠিত মনে তাঁকে গুরু ও পথ-প্রদর্শক বলে জানেন, এবং রাজনৈতিক তাঁরই রচনায় স্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহ দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মহিমা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না কেবল বুঝতে পারি আজ ঘরে ও বাইরে, সমাজে ও স্বদেশে জীবন বল্‌তে আমরা যা বুঝি তা তাঁরই হাতে গড়া।

সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ কেমন করে আমাদের জন্য এই নতুন পৃথিবী গড়ে তুললেন সে ইতিহাস লেখা হ'তে এখনো অনেক দেরী আছে। তবে প্রাক্‌-রবীন্দ্র বাঙালী জীবনের প্রায় যে কোন ক্ষেত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আমাদের আজকের জগতের সঙ্গে তার তফাৎ কত বেশি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করে গেছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি আমাদের নতুন জীবন এবং নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে বহুদিন আগেই। যেদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না সেদিনের গদ্যভাষা আজ পড়লে বোঝা যায় সাহিত্যের ভাষা সেদিন ছিল মুখের এবং মনের ভাষার চেয়ে কতদূরে। এমনকি মুখের ভাষাও

সেদিন আজকের মত সহজ সরল ছিলনা। তাই মনের ভাষা সোজাসুজি প্রকাশ করতে আমরা জানতুম না। আমাদের ভাষাই তো দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কথাটা শুনতে ছোটো শোনায় কিন্তু এ যে কত বড় দান তা কি আমরা ভাবতে পারি? আজকে কথা বলতে গেলে মুখে আসে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ভাবতে গেলে মনে আসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা—আমাদের জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা শুধু কবি বলে জানেন, তাঁরা সূর্যের শুধু একটা রশ্মি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত কর্মী আমাদের দুর্ভাগা দেশের কথা ছেড়ে দিই, পৃথিবীতেই খুব কম জন্মায়। শিক্ষায় তিনি আমাদের নতুন পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, হয়তো সে-পথ ধরে কোন দিন এগিয়ে যাবার সুযোগ আমরা পাবো। আমাদের দেশের আদর্শ ও বাণী তিনি বহন করে নিয়ে গেছেন দূর-দূরান্তরে জগতের সমস্ত কোনায়। জগতের সামনে আমাদের দেশকে তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। নোবেল পুরস্কার তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে সম্মানিত হয়েছে। যতদিন তাঁর দেহে সামর্থ ছিল, সমস্ত জাতিকে কর্মে প্রেরণা জোগাবার জন্য তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, পরিশ্রমে তাঁর ক্লান্তি আসেনি। তাঁর সারাদিনের কর্মবহুল দিনের শেষে তিনি সৃষ্টি করতে বসেছেন নতুন আশার বাণী। সেদিনের কথা, সেই ১৯০৫ সালের কথা বাঙালী কি কখনো ভুলবে?

সুদীর্ঘজীবনে কতবার কবি মৃত্যুর আহ্বান শুনেছেন, কতবার তিনি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিঃস্ব এই জাতিকে কতই যে তাঁর দেবার ছিলো! তাঁর কাছ থেকে কতই না আমরা পেয়েছি; তবু মনে হয় আরো কেন পেলাম না! দরিদ্র আমরা; তাই পেয়ে আর যেন আশা মেটে না। তাছাড়া এমন করে আমাদের দেবার

তো আর কেউ নেই। আর কে দেবে বাঙালীর গানের সাজি এমন পরিপূর্ণ ক'রে ভরে? আর কে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে সে চেতনা যার মধ্য দিয়ে জীবন তার সমস্ত হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনাকে নতুন অনুভূতিতে মহিমান্বিত ক'রে?

"এই করেছো ভালো নিঠুর, এই করেছো ভালো
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো,
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।"

—এত বড় অনুভূতির কথা আর কার মুখ থেকে আমরা শুনবো?

বর্ষা মেঘের অন্তরালে

মৌমাছি

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান চমৎকার। অতুলনীয়। এ কথাটা অনেক মুখ থেকেই হয়তো শুনেছ। জেনে রেখো কথাটা একেবারে খাঁটি সত্যি। কিন্তু জানকি 'রবীন্দ্রনাথ' কেমন করে এমন সব চমৎকার গান লিখতে পেরেছিলেন? তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই বাইরের বিশ্ব প্রকৃতিকে সমস্ত মন দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন—তিনি ছেলেবেলায় ছেলেমানুষী কৌতুহল আর আনন্দ নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতির খেলাঘরে। পুকুরের জল, গাছতলার ফুল ফল, আকাশের চাঁদ তারা—এরাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার প্রথম পাঠ। বইয়ের পড়া—পড়ার চেয়ে এই সব দেখা আর জানার মধ্যে দিয়ে যে সহজ ছন্দের পড়া তাই তাঁর পড়তে ভাল লাগতো সব চেয়ে বেশী—এ সব কথা তোমরাও হয়তো জানতে পেরেছ—যারা তাঁর ছেলেবেলার জীবনী পড়েছ। তাই আজ সে সব কথা না বলে সন্ধান দেবো—'বর্ষা' ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ কেন ভালবাসতেন সব চেয়ে বেশী! ছোটবেলা থেকেই বর্ষার প্রতি ছিল তাঁর কত নিবিড় অনুরাগ। সে কথা জানতে পারলাম—এই সেদিন যখন ১২৯২ সালের শ্রাবণ মাসের প্রাচীন 'বালক' পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম। তাতে রয়েছে 'বর্ষার চিঠি' বলে কবির লেখা একটি পুরোনো রচনা—সেটা পড়ে মন নেচে উঠলো—কারণ তার মধ্যে দিয়ে যেন দেখতে পেলাম—বিশ্বের সেরা কবি বাদলার দিনে খেলে বেড়াচ্ছেন দুরন্ত কিশোররূপে। এত ভালো লাগলো যে

আজ তোমাদের সেই লেখার খানিকটা না পড়িয়ে ছাড়ছিনা। এটা পড়তে পড়তে মনে হবে কবিকে তোমরাও দেখছো চোখের সামনে —পড়ো এখান থেকে—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মনে পড়ে, বর্ষার দিনে আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতাম—বাতাসে দুমদাম করে দরজা পড়তো, প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়তো, উঠোনে এক হাঁটু জল দাঁড়াতো, ছাদের উপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়তো ও ফেনিয়ে উঠতো। চারটে জলধারাকে দিকহস্তীর শুঁড় বলে মনে হতো। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুটতো (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াতো —বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাকতো এবং পুকুরের বড়ো মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কী অন্ধকারই হয়ে যেত এবং বর্ষাকালের সন্ধ্যেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাষ্টার মশায়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হতো তা যদি মাষ্টারমশায় টের পেতেন তা হলে—।"

বর্ষাতে তাঁর এই যে আনন্দ এর মূল কারণ যে কি—তাতো তিনিই তোমাদের বলে গেছেন—তাঁর 'ছড়ার ছবি' বইটার "আকাশ" কবিতাতে, সেই লাইন কটা মনে নেই ?

> "শিশুকালের থেকে
> আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে
চুরি করতেম আকাশ ভরা সোনার বরণ ছুটি
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।"

ঘরের বাঁধন তাঁর ভালো লাগতো না—আকাশে তিনি পেতেন ছুটি—ছোটবেলা থেকেই মনটাকে ছেড়ে দিতেন দিকজোড়া আকাশের কোলে। আকাশ ছিল তাঁর মনের চিরদিনের খেলাঘর—তাই সেখান থেকে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখেছেন—ফুল ফল ষড়ঋতুর যে সাজগোজ তাঁর নজরে পড়েছে তা আর কোন কবির চোখে পড়েনি। তাই তেমন করে কেউ লিখতেও পারেন নি।

ছোটবেলাতেই তিনি দেখতে শিখেছিলেন—বিশ্বের রূপকে দু চোখ মেলে—বর্ষা বাদলের গান শুনেছিলেন বৃষ্টির ঝমঝমানি সুরে—তাইতো বড় হয়ে লিখতে পেরেছিলেন—

"বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা॥"

কি চমৎকার গান বলতো! বৃষ্টি যখন ঝরে পড়ে আষাঢ় শ্রাবণ

মাসে তখন তোমাদের মনেও ঠিক ঐ সব কথাই ভেসে উঠবে—যদি তোমরা তাঁর মতন মনটিকে পবিত্র ও সহজ করে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাও। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের গাইবার মত অনেক সুন্দর সুন্দর গান রেখে গেছেন—সে সব গান যদি বেছে নিয়ে ঠিক ঠিকমত শিখতে পারো তাহলে দেখবে ছয় ঋতুতে তোমরাও নতুন নতুন জীবন পেয়ে নতুন আনন্দের গান গেয়ে আনন্দোজ্জ্বল কিশোররূপে জেগে উঠছো।

বাইশে শ্রাবণ কবি ছেড়ে গেছেন এই পৃথিবীর মাটি—একথা ভেবে তোমরা শোকে ম্রিয়মান হয়ো না—শোক করতে তিনি বারণ করে গেছেন। 'শ্রাবণ'কে কবি তাঁর বহু রচনায় অমর অক্ষয় করে গেছেন—আষাঢ়-শ্রাবণের বাদল ঝরার মধ্যে চিরদিনই তিনি এই পৃথিবী ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—আজও বেড়াচ্ছেন। আকাশে মেঘের দলকে জুটতে দেখলেই তিনি জেগে উঠতেন—

"পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন
অঙ্গনে
(শোন শোনরে) মনরে আমার, উধাও হয়ে
নিরুদ্দেশের সঙ্গনে॥
দিক হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন
সীমা লঙ্ঘনে॥"

এসো না আমরা সবাই মিলে কবির শোকের আয়োজন না করে এই বর্ষার মধ্যেই ঘরের কোণের শাসন সীমার বাঁধন ভেঙ্গে কবির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। দল বেঁধে গেয়ে চলি কবির সুরে সুর মিলিয়ে শ্রাবণের গান—বর্ষার গান—তাহলে নিশ্চয় তাঁকে আমরা দেখতে

পাবো। ভাবছো মিথ্যে কথা বলছি—শ্রাবণের পুণ্যদিনে চেয়ে দেখো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে—গেয়ে ওঠো এক সঙ্গে—

"শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ওই-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে—
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে ওই তো আমার লাগায়ে মনে
পরশখানি নানা-সুরের-ঢেউ-তোলা॥"

এই শ্রাবণে বর্ষা মেঘের অন্তরালে কাকে দেখছো এবার বলতো। রাঙা অরুণ—রবিকে। ঐ রবিই তো আমাদের ভারতভানু রবীন্দ্রনাথ—দিনরাত্রি ষড়ঋতুর চিরদিনের চিরসাথী—আকাশই যে তাঁর ঘর—কাজেই নানা সুরের ঢেউ তুলে অমর হয়ে রবেন তিনি চিরদিনই।

রবীন্দ্রনাথের টুকিটাকি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তার জবাব পান নি, এমন লোক কেউ আছেন কিনা জানিনা। বোধ হয় নেই।

জ্ঞানী গুণী ও নাম-ধামওয়ালাদের কথা ছেড়েই দাও। অন্তঃ-পুরচারিণী মহিলা, গ্রামের স্কুলে অধ্যয়নরত বালক, হাসপাতালের বিছানায় শায়িত ছোট্টমেয়ে, তাঁকে চিঠি দিয়ে উত্তরে বঞ্চিত হতে দেখিনি কারোকেই।

বলা দরকার যে এই সব সাধারণ মানুষরা তাঁকে যে চিঠি দিতেন, তা কোন দরকারী ব্যাপার নিয়ে নয়। কারো দরকার একটি অটোগ্রাফের। কেউ চান হস্তলিখিত পত্রিকার জন্যে একটি আশীর্বানী। কারো চাই কোন অদ্ভুত জিজ্ঞাসার জবাব, অথবা কোন উদ্ভট তর্কের সমাধান!

মজা এই যে কারোকেই তিনি হতাশ করতেন না। কি ধরণের সব চিঠি পেতেন তিনি আর কি তার জবাব দিতেন, একটু নমুনা দিচ্ছি তাহলেই বুঝবে।

একটি ছেলে লিখল, তার ইচ্ছা সে স্বদেশী আন্দোলনে নামে। বাবামার ইচ্ছা সে পাশ করে বেরোয়। কোনটি করবে সে? কবি লিখলেন, বাবা-মার কথাই শুনো, ওটাও বিদেশী আন্দোলন নয়।

একজন গ্রামের মানুষ লিখলেন, দাড়ি রাখলে কি মানুষ

দীর্ঘজীবী হয় ? সেকালের মুনি-ঋষিরা দাড়ি রাখতেন কি এই জন্যে ?

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, দাড়িও রেখেছি, দীর্ঘজীবীও হয়েছি। কাজেই হতে পারে হয়ত। কিন্তু অল্প বয়সে যারা মারা যায়, দাড়িটা তাদের বড় হতে পারে না। কাজেই উল্টো দিক থেকে ত প্রমাণ করা গেল না জিনিষটা।

একটি প্রশ্ন এল, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন কি ? দেখেছেন কখনো ? তিনি লিখলেন, তা আর করি না ? চারিদিকে এত মারপিট, লুটপাট ও দাপাদাপি করে বেড়ায় কে তা না হলে ? খবরের কাগজেই বা এত গণ্ডগোল বাধায় কে ?

এই সব সাধারণ মানুষের সাধারণ জিজ্ঞাসার জবাব আমাদের দেশে মাঝারি রকম মানুষরাও দেন কি ? দিই কি তুমি আমিও ? কিন্তু অত বড় জগৎজোড়া নামের অধিকারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ দিতেন এবং দিতেন বেশ আনন্দ করেই।

একটি মেয়ে লিখল, তার কবিতা লিখতে ভারী ইচ্ছা। কিন্তু প্রথম লাইনটা কোন মতে লিখলেও মিলের উৎপাতে পরের লাইনটা সে কিছুতেই আর দাঁড় করাতে পারে না। এই যেমন, সারাদিন বসে আছি জানলার ধারে...

এর পরে আর কিছুতেই মেলাতে পারছেনা। তিনি যেন বাকীটা মিলিয়ে দেন।

কবি লিখলেন,

> সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে
> উদাস ফাগুন হাওয়া ডাকিছে আমারে।
> বাইরে চাঁপার বনে লাগে সেই হাওয়া
> মনে মনে জাগে সাধ বসে গান গাওয়া।
> আকাশে মেঘের তরী চলে ভেসে ভেসে...

এই পর্যন্ত লিখেই লিখলেন, এবার কিন্তু আমি আর মেলাতে পারছিনা। বাকীটা তুমি মিলিয়ে নাও।

সত্যিই কতখানি উদার হৃদয় এবং কি রকম মজার মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বলত। এই মানুষের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখে এসো আজ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিই আমরা!

মেঘের তলে পাখি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দেবতাকে কে আর চোখে দেখেছে, কিন্তু সবাই জানে দেবতা কাকে বলে। এ কালে আর তেমন চট করে দেবতার আবির্ভাব ঘটে না, সময়টা তেমন অনুকূল নয়। দেবতার কাছাকাছি যে-মানুষকে আমরা দেখেছিলাম তিনি রবিঠাকুর।

তিনি বলেছেন—"জীবনের মধ্যে গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাইনি, নিজের মধ্যে পেয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"

তাইতো বলতে পেরেছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।"

পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ।

দুটি দিনে কত তফাৎ, কি বিরাট ব্যবধান। আকাশের অধীশ্বর যেন একটি পরমলগ্নে এই মর্তভূমিতে এসে ধরা দিয়েছিলেন আর অপর তিথিতে তিনিই অন্ধকারের পারে পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

'জল পড়ে পাতা নড়ে,' রবীন্দ্রনাথের জীবনে আদি কবির কবিতা। কতদিন কত হাজার হাজার মানুষ ত' ওই কথা কটি পড়েছে, কারো প্রাণে ত' ওই কথা কটি এমন আবেগ জাগায় নি! আর ছিল শৈশবের মেঘদূত—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।'

চাণক্যশ্লোক ও বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভৃত্যমহলে তাঁর জীবনের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত, ব্রজেশ্বর চাকর কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাত, আর—

'কিশোরী চাটুয্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউরে যেত লব কুশের ছড়া—
থাক্‌ত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাক্‌ত পড়া'

মনে হত পাঁচালির দলে নাম লিখিয়ে নতুন নতুন গাঁয়ে গান শুনিয়ে বেড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নতুন নতুন গাঁয়ে গানের পালা শুনিয়েছেন।

তাঁদের বাড়ির শাসন ছিল কড়া। এই সময়টা তাঁরা চাকর-বাকরদের শাসনেই থাকতেন, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'। বাড়ির বাইরে পর্যন্ত যাওয়া চলত না। শ্যাম বলে একটা চাকর ছিল, সে রবীন্দ্রনাথের চারিদিকে একটা গণ্ডী এঁকে দিয়ে বলত—'সাবধান! এর বাইরে পা বাড়িয়েছ কি বিপদে পড়েছ।'

কি আর করবেন, ম্লানমুখে সেই গণ্ডীর ভেতর চুপ করে তিনি বসে থাকতেন। জানালা দিয়ে বাইরের জগতের দিকে মহাবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। মনে হত বিশ্বপ্রকৃতি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে :

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে,
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে,
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা—
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যাবেলা'।"

ঠাকুরমার আমলের পাল্কীতে বসে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ, আর ঠিকানা হারিয়ে চুপ করে বসে

আছেন রবিনসন ক্রুশো, চাকরদের হাতে নজরবন্দী। পাল্কীর বাইরে রেলিংগুলো ছাত্র, কড়া মাস্টারের ভয়ে আড়ষ্ট, তার মধ্যে একটা রেলিং দুষ্টু, কিছুতেই পড়া মুখস্থ করে না। আর একটা খেলা ছিল সিঙ্গিবলি। অন্য লোকের কাছ থেকে ধার করে নিজের মনের মত মন্তর তৈরী করলেন ছোট্ট রবি—

"সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দি বোসের বাটুম,
উলকুট্, ঢুলুকুট্ ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্
আখরোট বাখ্‌রোট খট্ খট্ খটাস।
পট্ পট্ পটাস॥"

আখরোট খেতে ভালবাসতেন তাই আখরোটটা এর মধ্যে বসিয়েছিলেন নিজে থেকে।

পুকুরঘাটে সবাই জল নিতে আসে, তার ধারে এক বিরাট বট গাছ। ছোট্ট রবি সারা দুপুর জানলায় বসে সেই বটগাছ দেখছেন, তার রহস্যময় অন্ধকার তাঁর মনে কৌতূহল সৃষ্টি করত। তাই একদিন বড় হয়ে সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি বটগাছকে অমর করে লিখলেন—

"নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোট ছেলে মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট?"

আবার যখন ফেরিওলা হেঁকে যায় 'চাই চুড়ি চাই', 'খেলনা চাই' আর ছোট্ট রবির মনে হয়—

"আমি যাব রাজপুত্তুর হয়ে
নৌকোভরা সোনামানিক বয়ে—
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে
আমরা শুধু যাব মা তিনজনে।

আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তের নদীর পার।”

পড়াশোনা সুরু হল। যখন ছোট্ট রবির সমবয়সীরা পড়ছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও তিনি বি এ ডি ব্যাড এবং এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত পৌঁছান নি। সেই ছেলেই একদিন নর্ম্যাল স্কুলে গিয়ে শুনলেন—

“কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।”

কি যে মন্ত্র কিছু বুঝতেন না। অনেক চিন্তা করে পরে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন—“Full of glee, Singing merrily, merrily, merrily”—কলোকী কথাটি কোনদিন অর্থভেদ করা যায়নি। সেই সময় সাত আট বছর বয়সে তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো ভাগনে জ্যোতিপ্রকাশ একদিন দুপুরবেলা তাঁর ঘরে ডেকে বললেন—“পদ্য লিখতে হবে তোমাকে।” এই বলে পয়ার ছন্দের চোদ্দ অক্ষরের রীতিনীতি বুঝিয়ে দিলেন।

সারা বাংলাদেশ এই জ্যোতিপ্রকাশের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “তারপর ভয় যখন একবার ভাঙল তখন আর ঠেকায় কে! কর্মচারীর কাছ থেকে একটি নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ করে তার উপর পেনসিল দিয়ে কয়েকটি অসমান লাইন টেনে সুরু হল কবিতা লেখা।” আর পেলেন শ্রীকণ্ঠবাবুর মত উৎসাহী শ্রোতা।

মহর্ষিদেব বিদেশ থেকে ফিরে যখন জোড়াসাঁকোয় থাকতেন তখন ছেলেদের গোলমাল দৌড়োদৌড়ি করা নিষেধ ছিল। তারা তাই ধীরে ধীরে চলে, ধীরে ধীরে কথা বলে। এইসময় একদিন তেতলার ঘরে মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথকে ডাকলেন। রবীন্দ্রনাথের মাথাটি নেড়া, সবে পৈতে হয়েছে। মহর্ষি তাঁকে হিমালয় যাত্রার প্রস্তাব জানালেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “যদি আকাশ ফাটা চীৎকার করে

বলতাম—'চাই' তবে আমার মনের উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করা হ'ত।" কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!

একবার মাঘোৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান রচনা করেন, এরই একটি গান 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। মহর্ষিদেব চুঁচুড়ায় একদিন রবীন্দ্রনাথের নতুন সব কটি গান শুনলেন। তারপর বললেন: 'দেশের ভাষা যদি রাজার জানা থাকত তাহলে তিনিই পুরস্কার দিতেন, তা সম্ভব নয় যখন তখন আমিই সেই কাজ করছি।' এই বলে একখানি পাঁচশো টাকার চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই প্রথম পুরস্কার, স্বয়ং পিতৃদেবের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি লাভ।

উত্তরকালে সেই মানুষই তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে ঘুরে বিশ্বজয় করেছেন। বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান লেখক যোহান বোয়ার বলেছেন—"He is India bringing to Europe a new divine Symbol, nor the Cross but Lotus."

দিব্যজীবনের নতুন প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন নয়—সহস্রদল শুভ্রপদ্ম।

বুড়ো ঘোড়ার পাল্‌কী গাড়িতে চড়ে দশটা-বারটার আন্দামানে যাত্রা। আর দিনরাত মাষ্টার, হয় জিমনাস্টিক, নয় ইংরেজী, কিংবা বাংলা। এমন কি মড়ার খুলি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র পর্যন্ত। ওরই মাঝে একদিন রাতে 'নল দময়ন্তী'র পালা শোনা গেল; রাত ফুরিয়ে এলেও যাত্রা ফুরোয় না, তাই তার মাঝেই নেতিয়ে পড়ত ঘুমে কাতর চোখ, কখন যে দেহটাকে কে কোলে করে বিছানায় এনে দিয়েছে জানতে পারা যেত না। ঘুম ভেঙে দেখেন মায়ের তক্তোপোশে শুয়ে আছেন।

তখনকার কাল রবীন্দ্রনাথের মতে রাজপুত্তুর আর এখনকার কাল সদাগরপুত্তুর।

একটানা দিন চলে, তার খানিকটা খাবলে নেয় ইস্কুল—এর মাঝে কখনও আসে ভালুকনাচওলা। সাপুড়ে আসে সাপ খেলাতে, কিংবা ভোজ-বাজিওলা।

পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ডুগ্‌ডুগি বাজে না, সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ, সে যুগ আজ আর নেই, সেই শ্যাকরা গাড়ি ছোটা রয়ে বসে চলা দিন আর নেই। এখন কাজের হাঁসফাসানিতে সবাই হাঁফিয়ে উঠছে।

এই বাস-ট্রাম-মোটর গাড়ির যুগে কি রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব? দেবতারা আর ত' জন্মায় না এখন, পুরাণের কালে চট করে দেখা যেত তাঁদের। কারণ কালটা ছিল তাঁদের আবির্ভাবের উপযোগী। তাই রবীন্দ্রনাথও বলেছেন মেঘের তলায় পাখির মত মন দিয়ে ঘেরা এক হালকা জগতে তিনি চলাফেরা করেছেন। সেখানকার আকাশের অনেক রকম রঙ, নানা রঙের সুতোয় তার জাল বোনা।

নোবেল পুরস্কার

সুশীল রায়

১৯১৩ সাল, ১৫ নবেম্বর। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পূজোর ছুটির পর দিন কয়েক মাত্র আগে খুলেছে। এমনি একদিন রবীন্দ্রনাথ মোটরগাড়ি করে রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে চলেছেন। বছরখানেক বিদেশে কাটিয়ে এসে তিনি আবার পুরাতন পরিবেশের মধ্যে পড়েছেন; এখানকার পারিবারিক অশান্তি ও বিদ্যালয়-সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি নানাবিধ তিক্ততার মধ্যে পড়ে তিনি হাঁফিয়ে উঠেছেন, তাই কলকাতা ত্যাগ করে পূজোর ছুটি শেষ হবার আগেই চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এ-স্থানও তো নিরাপদ নয়, এখানেও অভাব আছে অভিযোগ আছে; কবির তাই নিজেকে অসহায় বোধ হয়ে থাকবে। বিদেশে তো বেশ ছিলেন, প্রাত্যহিক এ দ্বন্দ্ব-কলহ অভাব-অভিযোগের থেকে অন্তত নিজেকে তফাতে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ পৃথিবীতে শান্তির পিছনে ধাওয়া করলেই শান্তি লাভ করা যায় না। তবুও মনকে মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কবি সম্ভবত সেই আকাঙ্ক্ষায়ই ভ্রমণে নির্গত হয়েছিলেন। তিনি চলেছিলেন চৌপাহাড়ি-শালবনের নির্জনতায় নিজের মনকে মেরামত করতে। প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যায় পাখীর পালক, তখনও সে পাখী হতাশ না হয়ে পাখায় ভর করে ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে ঝড়ের এলাকা পার হয়ে যাবার চেষ্টা করে, সে এলাকা পার হয়ে সে আশ্রয় নেয় নির্ঝঞ্ঝাট এক প্রশাখায়, নিশ্চিন্ত মনে তখন সে বসে বসে নিজের ঠোঁট দিয়ে মেরামত

করে তার পালক। হয়তো কবিও তেমনি ঝড়ের এলাকা পার হয়ে শালবনে নিশ্চিন্ত আশ্রয় অভিমুখেই চলেছিলেন। সহসা সেই যাত্রাপথে বাধা পড়ল। টেলিগ্রাম। দুঃসহ সুসংবাদ বহন করে এনেছে একটুকরো কাগজ। ১৯১৩ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ!

তখন বেতারের যুগ নয়; বেতারের যুগ হলে এ সংবাদ তাঁরা পেয়ে যেতেন আরও দু'দিন আগে। কেননা, ১৩ই নবেম্বর তারিখের এম্পায়ার নামে অধুনালুপ্ত এক ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকায় এ সংবাদ কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছেলেবেলায় আমরা নোবেল পুরস্কারের নাম শুনি। তখন আমাদের ধারণা ছিল, এটা বুঝি নোব্‌ল পুরস্কার, noble বলে গণ্য এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে। পরে অবশ্য বুঝেছি যে কথাটা noble নয়, nobel। সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে জন্মগ্রহণ করেন অ্যালফ্রেড নোবেল নামে এক ব্যক্তি, উত্তরজীবনে যিনি এক যশস্বী পুরুষ হয়ে ওঠেন নিজের দক্ষতায় ও সাধনায়। এঁরই নাম অনুসারে ১৯০১ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। ইনি ১৮৬৫-৬৬ সালে ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। আমেরিকায় এবং ইউরোপের নানা জায়গায় ইনি তারপর এর কারখানা স্থাপন করেন। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইনি প্রভূত পরিমাণ অর্থের অধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুর (১৮৯৬) আগেই তিনি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বিশ্বের কল্যাণে উৎসর্গ করে যান। এই টাকার সুদ থেকে ৮ হাজার পাউণ্ড করে পাঁচটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ সাধককে প্রতি বছর মোট ৪০ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে—সাহিত্য, বিশ্বশান্তি, জড়বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান।

সুইডিশ অ্যাকাডেমি এই পুরস্কার প্রতি বছর নবেম্বর মাসের

প্রথম দিকে ঘোষণা করেন। ১৯০১ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই দেওয়া, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন ১৯১৩ সালে। তাঁর পূর্বে বারো জন সাহিত্যিক এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে বারোজন এই পুরস্কার পান, তাঁদের মধ্যে চারজন জর্মান, তিনজন ফরাসী, একজন সুইড, একজন নরোয়েজিয়ান, একজন পোল, একজন ইংরেজ ও একজন স্প্যানিস।

রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান লাভ করা তখন এক অভাবনীয় ঘটনা বলে মনে হয়। কেননা বৃটিশের পরাধীন এক দেশের একজন কবি যে বিশ্বসভায় এভাবে সম্মানিত হতে পারেন, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। যে পুরস্কার ইতিপূর্বে সীমাবদ্ধ ছিল কেবল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, সেই সম্মানের পুরস্কার একটি মহাদেশের সীমা লঙ্ঘন করে এশিয়া নামক অপর এক ভূখণ্ডে এসে পৌঁছে গেল। সেইদিন রবীন্দ্রনাথ কেবল ভারতবর্ষের বা বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল করলেন না, এশিয়া মহাদেশের মুখ সেইদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এই পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে সর্বপ্রথম যাঁর কথা রবীন্দ্র-নাথের মনে পড়ল, তিনি হচ্ছেন রোটেনস্টাইন। তিনি তাঁর এই পরম সুহৃদকে চিঠি লিখলেন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। তিনি লিখলেন যে, এই সম্মানের গৌরবে তিনি আজ গৌরবান্বিত বটে, কিন্তু এই গৌরব রোটেনস্টাইনের ভালোবাসা ও স্নেহের দ্বারা আবৃত।

এর হেতু কি? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছেন সসঙ্কোচে, কেননা তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজিতে তাঁর দখল খুব বেশি না। দ্বিধাজড়িত চিত্তে তিনি এই অনুবাদ করেছেন। ১৯১৩ সালের ৭ই মে তারিখে লণ্ডন থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবীকে তিনি যে চিঠি দেন, তাতেই তাঁর মনোভাব জানা যায় এবং রোটেনস্টাইনের কথাও তাতে আছে। মে মাসে, অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার

মাস ছয় আগের ঘটনা এটা। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রে লেখেন—

'গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল, সেকথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারিনে একথাটি এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনোদিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখত তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে—একেবারেই? তা নয়—ইংরেজিতে লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়।...একটি ছোট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মনটি যখন উসখুস করে উঠবে তখন ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে হবে। ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন।'

রটেনস্টাইনের প্রতি কবির যে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তার মূল এইখানে। বিশ্ব সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যিনি প্রথম পেশ করেন, তিনি হচ্ছেন এই রটেনস্টাইন।

অনেকের ধারণা ছিল এবং এখনো অনেকের সম্ভবত এইরূপ ধারণা আছে যে, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বীকৃত হওয়ার পর স্বদেশীয় সুধীসমাজ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাবার জন্যে উদ্যোগ করেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। ১৩ই নবেম্বর তারিখে কলকাতায় এই শুভ-সংবাদ প্রকাশিত হয়, এর দশদিন পরে ২৩শে নবেম্বর তারিখে শ'পাঁচেক নরনারী এক স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে শান্তি-নিকেতনে কবিকে সম্বর্ধনা করার জন্যে গমন করেন। এর থেকেই উপরোক্ত ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কবিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন অনেক আগে থেকেই সুরু হয়, অর্থাৎ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি সংক্রান্ত সংবাদ জানার আগে থেকেই। কবির প্রতিভাকে স্বীকার করে কলকাতার রবীন্দ্র অনুরক্তগণ তাঁকে সম্বর্ধিত করতই; মাঝখান থেকে অতর্কিতে এই পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এক পত্রেও এর উল্লেখ আছে। তিনি যখন বিদেশ থেকে ফিরে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতন আসেন, তখন এক পত্রে লেখেন,—

"শুনতে পাচ্ছি ছুটির পর নভেম্বর মাসে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার ষড়যন্ত্র এবং টাকা আদায় চলছে।"

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এক পত্রেও এর উল্লেখ আছে—

"গুজব শুনেছি ছুটির পরে আমাকে নিয়ে একটা উৎপাত করবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।"

আম্রকুঞ্জে এই সুধীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করেন। এর উত্তরে তখন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তা অনেকের মনঃপুত হয় না। অতিথিদের অনেকেই নাকি এতে মর্মাহত হন। উৎসাহের

এই আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত বিচলিত হয়ে থাকবেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয় এই যে, এই সম্মানটা তাঁকে দেখানো হচ্ছে না, তিনি যে সম্মান সম্প্রতি লাভ করেছেন, সেই সম্মানকেই যেন সম্মান দেখানো হচ্ছে। রটেনস্টাইনকে লিখিত পত্রেও এই মনোভাবের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন।

১৯১২ সালের নবেম্বর মাসে গীতাঞ্জলি (ইংরেজি) প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে এই কাব্যের সম্বন্ধে স্বদেশ ও বিদেশে যা-কিছু আলোচনা হয়েছে তা কেবল এর সাহিত্যিক বিচার। কিন্তু নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর বিদেশের সমালোচকগণ কবির কাব্যকে ত্যাগ করে কবির বিচারে প্রবৃত্ত হলেন; তাঁরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। একটি পত্রিকা তো এমন কথাও লিখে বসল যে,—

"The Protest of all European nation will be raised against Rabindranath Tagore."

এঁদের উষ্মার কারণ এই যে, তাঁরা Rossegger নামে একজন জর্মান সাহিত্যিকের হয়ে নোবেল পুরস্কারের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা হয়, তার কারণ বৃটিশ পদানত একটি দেশের একজন কবিকে এই সম্মান দেওয়া হল কেন? একটি পত্রিকা লিখলেন,—

"This will remain the secret of the judges in Stockholm."

বলাবাহুল্য, যাঁরা এইরূপ আলোচনা করেন, তাঁরা কেউই সাহিত্যিক নন, সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তি।

আমাদের দেশের অনেকের মনেও এই ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যখন এত সহজে এই সম্মানে বিভূষিত হলেন তখন হয়তো সামান্য

একটু চেষ্টা করলেই নোবেল-প্রাইজ পাওয়া যাবে। তাঁরা নিজেদের গ্রন্থাদি অনুবাদ করে সুইডেনে পাঠাতে শুরু করলেন।

অনেক বছর গত হয়েছে, এশিয়ার আর কোনো সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত এই সম্মানে বিভূষিত হলেন না।

মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স দশ কি এগারো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর তেতালার ঘরে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন হিমালয় ভ্রমণে যেতে রবি রাজী আছে কিনা। অল্প কদিন আগে উপনয়ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের মস্তক মুণ্ডন করে দেওয়া হয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ কেশবর্জ্জিত চকচকে মাথাটি নিয়ে কি করে স্কুলে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই ভীত চিন্তায় বিশেষ ক্লিষ্ট ছিলেন। তাই বেঙ্গল এ্যাকাডেমি স্কুল থেকে হিমালয়ের দূরত্ব পর্ব্বতপ্রমাণ হলেও পিতার প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জানাতে বিন্দুমাত্র দেরী হয়নি। তাছাড়া শৈশবের অনেকগুলি বছর ভৃত্যশাসিত হয়ে কাটানোর ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে চারদেয়ালের ক্লান্তিকর বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক দুর্বার আকুলতা জেগে উঠেছিল। পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। দেশভ্রমণ ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় নেশা। ফলে প্রায়ই তিনি কলকাতার বাইরে বাইরে থাকতেন। পিতার সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সুযোগও তিনি প্রথমবারের মতন পেলেন। যে ধনীপুত্রের দারুণ শীতের দিনেও কেবলমাত্র একটি সুতির জামার ওপর আরেকটি সুতির ফতুয়া জড়িয়ে শীত নিবরণ-করতে হ'তো সে ছেলের ওপর পিতা বা মাতার বাৎসল্য রস যে অতি প্রবল ছিল এমন বলা চলে না। এই বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ প্রথমবারের মত তাঁর পুত্রের দিকে ভালো করে তাকালেন। তাঁর আদেশ ও নির্দেশে সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের

জন্য সুন্দর ভালো পোশাক নির্মিত হ'লো। পিতার সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন পিতার বাইরের অভ্রভেদি ব্যক্তিত্ব ও পোশাকী গাম্ভীর্যের আড়ালে রয়েছে এক স্নেহ প্রবল পিতৃহৃদয় যিনি বালকের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন ইচ্ছাকে সম্মান করতে সর্বদা প্রস্তুত। সেই আবিষ্কারের আনন্দ ও স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী-কালকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছিল। নিজের জীবনস্মৃতিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোন জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিলনা। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায় আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলজ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোন কারণে কোন বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না"।

হিমালয়যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে কিছুদিন বোলপুরে ছিলেন। উত্তরকালে এই বোলপুর রবীন্দ্র জীবনসাধনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। বোলপুরের দিগন্তছোঁয়া আকাশের নীল রেখাটি, লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা পথ, রূপকথার ধূ ধূ তেপান্তরের মত তৃণগুল্মবিরল মাঠ, কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে এক অপূর্ব্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করতো। রাত্রে দূরের সাঁওতাল গ্রাম থেকে শোনা যেত বাঁশী, মাদলের দ্রিমিদ্রিমি আওয়াজ। নিস্তব্ধ জোৎস্নায় ভেসে যেত কাছের আম্রকুঞ্জের বউল ঝরানো আমোদিত পথ। পূর্বাচল থেকে পশ্চিমপ্রান্তে সূর্যদেবের যাত্রা

অন্ধকারে বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত নব নব দৃশ্য, বিস্ময়ের শেষ ছিল না। বোলপুরের আগে প্রকৃতির এত কাছে, এত অজস্র মুক্তির আনন্দে, রবীন্দ্রনাথের কিশোরচোখ এর আগে পৃথিবীকে দেখেনি। নিষ্পলক সূর্যের আলোর নীচে সারাদিন রবি একা একা ঘুরে বেড়াতেন বোলপুরের গেরুয়া প্রান্তরে। অথচ এই একক ভ্রমণের সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার আশু বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের স্বাধীন বিচরণের পথে কোন বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে দেননি। পুত্রের সমস্ত কাজে, আচরণে স্বাভাবিক উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "যদিচ আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানা প্রকার পাথরে গঠিত ছোট ছোট শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 'কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে'! আমি বলিতাম 'এমন আর কত আছে! কত হাজার হাজার!' 'সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও'।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম হিমালয় ভ্রমণ মূলত ডালহৌসী পাহাড়কেই কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল। বোলপুরের তুলনায় ডালহৌসীর পথঘাট

আরও বেশি বিপদসংকুল। পাহাড়ের সেই বিপদসংকুল চতুর্দিকের খাদ পরিবেষ্টিত পথেও দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন ভ্রমণ কোন ভৃত্য পরিদর্শক নিযুক্ত করে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেন নি। আশৈশব ভৃত্যরাজকতন্ত্র শাসিত রবীন্দ্রনাথের মনে শাসন সম্বন্ধে যে ভীতি জন্মেছিল, দেবেন্দ্রনাথ ততদিনে তা অবহিত হতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুল-বিরাগও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। হিমালয় ভ্রমণে পুত্রকে সঙ্গে নেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়ার কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান করা। সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছিল তা সঠিক জানা না গেলেও পিতার সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিলেন। এ দিক থেকে দেখলে ডালহৌসী ভ্রমণের স্মৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ধ্যায় তুষারমৌলি গিরিশিখর শীর্ষে যখন অগণিত নক্ষত্রমালার শোভা ফুটে উঠত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে সেই সব নক্ষত্রের নাম, বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কক্ষপথ প্রভৃতি চিনিয়ে জানিয়ে দিতেন। বিছানায় শুয়ে কাচের জানালার ভেতর দিয়ে নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখতে পেতেন রবীন্দ্রনাথ। এক-একদিন ঘুম ভেঙে দেখতেন শরীর একটি লাল শালে জড়িয়ে মহর্ষি নিঃশব্দপদসঞ্চরণে দেবমূর্তির মত হেঁটে চলেছেন বারান্দার উপাসনাস্থানে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই পুত্রের স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, দায়িত্ববোধ ও সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রায়ই তিনি রবীন্দ্রনাথকে দু-চার আনা পয়সা দিতেন। পথে কোন ভিখিরী চোখে পড়লে রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে ভিক্ষা দেয়াতেন। পরে পয়সার হিসাব নিতেন। শুধু তাই নয় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বহুমূল্য

সোনার ঘড়িটির দম দেয়ার ভার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। রবীন্দ্রনাথ ঘড়িটির যত্ন একটু বেশী পরিমাণেই করেছিলেন যার ফলে মেরামতের জন্য ঘড়িটিকে অবিলম্বে কলকাতা পাঠাতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। তিনি জানতেন এ দুর্ঘটনা তাঁর পুত্রকে ভবিষ্যতে সাবধান হতে শেখাবে। এভাবে ধীরে ধীরে দায়িত্বে দীক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার চরিত্রের সমস্ত সৎ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন সত্যকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতে না পারলে হৃদয় সত্যকে গ্রহণ করতেও পারবে না। ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ সত্য থেকে দূরে গেলেও হয়তো একদিন ফিরে আসতে পারে; কিন্তু কৃত্রিম শাসনে যে মানুষ অন্ধভাবে সত্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, সত্যের আনন্দে ফেরবার পথ তার কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ আজীবন কিরকম সত্যনিষ্ঠ ছিলেন একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তা সবিস্তারে ব্যক্ত করেছেন, "হিমালয় যাত্রার পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোন একটা বড় ষ্টেশানে গাড়ী থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল, উভয়ে আমাদের গাড়ীর দরজার কাছে উসখুস করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বার বোধ হয় স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে'। পিতা কহিলেন 'না'। তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের তুলনায় নিশ্চয় আমার বৃদ্ধি কিছু বেশী হইয়াছিল। ষ্টেশনমাষ্টার

কহিল, 'ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে'। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল। ষ্টেশনমাষ্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল"।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্মজীবনে পিতার প্রভাব অসীম। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময় অর্থপুরস্কারে উৎসাহিত করতেন। যে উপনিষদের প্রভাব কবিগুরুর ব্যক্তিসত্বাকে পরবর্তীকালে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিল তার অন্যতম উৎস ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পিতার মতো, যে কোন বিষয়ে, গুরুত্বে তা সে যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব নিষ্ঠায় ও আন্তরিকতায় তা সুসম্পন্ন করতেন। কৈশোরের শেষ ও যৌবনের সুরু পর্যন্ত সময়ের প্রতি যে মনোযোগ তিনি পিতৃদেবের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তা সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত দেখতে পাই। কবিতায়, গানে, ছোট গল্পে উপন্যাস নাটক প্রহসনে যে বিরাট রচনাসম্ভার তিনি রেখে যেতে পেরেছিলেন, অতিমর্ত প্রতিভার সঙ্গে সময়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধও ছিল তার প্রধান কারণ। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন "রবিকা কোন জিনিস এলোমেলো অগোছালো ভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এই শিক্ষা তিনি পুরোনো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো অনুষ্ঠানে

পান থেকে চুণ খসবার জো ছিলো না। সব ঠিক ঠিক হতেই হতো।"

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের পিতারা যে সবাই বিখ্যাত ছিলেন এমন নয়। বরঞ্চ দেখা গেছে অখ্যাত পিতার সন্তানই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিখ্যাত হন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখা যাবে যে সেই অখ্যাত পিতাদের মন্দে-ভালোয় নিশ্চয়ই কোন আপাত-অলক্ষ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাদের প্রতিভাবান সন্তানের সংবেদনশীল মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এক অভাবনীয় পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রতিভার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তসাধনা তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিল পূর্ণতার গৌরবে। শৈশবে ভৃত্যবেষ্টিত নিঃসঙ্গতা যখন তাঁকে জানালার প্রতিবেশী আকাশ মাটিকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল, কৈশোর ও যৌবনে পিতার সান্নিধ্য যেমন সত্য ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রাচীন ভারতের সত্যধ্যান সম্পর্কে অভিজ্ঞান অর্জন করিয়েছিল, তেমনি তার সার্থক সাধনায় আমাদের কাছে রেখে গেলেন এমন এক অজেয় স্মৃতি যা শতাব্দীর সমস্ত প্রশ্নকে ধারণ করে আজো অম্লান, ভাস্কর।

রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই কবেকার এক বাইশে শ্রাবণ মুছে গেছে অনেক বর্ষার জল-ধারায়, সেদিনের ব্যক্তি-বিয়োগের দুঃখ আজ ইতিহাসের অক্ষর তবু রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইনি, কখনো হারাতে পারি না।

শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণের' সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নেই। কী অবিশ্বাস্য এই না থাকা, কী শূন্য এই শান্তি-নিকেতন। ভারাতুর মন নিয়ে ফিরে এলাম গেষ্টহাউসে। আর বিষণ্ণ সন্ধ্যার আকাশকে কালো করে নেমে এল অশ্রান্ত বৃষ্টি।

ইলেক্‌ট্রিকের আবছায়া আলো নিঃশেষে মুছে গেল সেই বৃষ্টিতে। দূরে মাঠের পারে বিদ্যুতের আলোয় ঝলকে উঠতে লাগলো শাল-তালের চঞ্চলতা। আর তখনি আমি দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে। দেখলাম 'বরষণ মুখরিত অন্ধকারে' কোন দিগন্তের পার থেকে তিনি আসছেন—'সজল-সন্ধ্যার একটি কেতকী' তাঁর হাতে 'মেঘে মেঘে তড়িৎ-শিখার ভুজঙ্গ-প্রয়াতে' শুনতে পেলাম তাঁর কবিকণ্ঠ।

আর একদিন। উদয়াস্ত দমচাপা কাজের ভিড়। জীবিকার অসহ্য তাড়না। যখন একটুখানি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেলাম, তখন রাত বারোটার কাছাকাছি।

ছাতে উঠে এলাম। খানিক দূরে চারতলা মেস বাড়িটা ছাড়া কোনো জানলায় আর আলো জ্বলছে না—এখন 'ঘরে ঘরে রুদ্ধ-দুয়ার'। শান্ত স্তব্ধ আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে যখন সারাদিনের হিসেব তলিয়ে নিতে চাইছি তখন কানে এলো বহুদূর থেকে কে যেন সেতার বাজাচ্ছে। বেহাগের সুর।

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম আকাশের দিকে। চন্দ্রহীন আকাশে নক্ষত্রের জ্যোতির্বাসর। ওই সেতারের সুরটা আমাকে তুলে দিল আমিত্বের আবরণ থেকে—ছাড়িয়ে গেল এই কলকাতা, এই পৃথিবী : আমি দেখলাম আমার সমস্ত চেতনা ওই সুরের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। ওই সুর মাটিতে বাজছে না, মানুষের হাতে একটা যন্ত্রেও নয়—সমস্ত আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে—ওই অগনিত নক্ষত্র তারই অগ্নিবিন্দু।

আর তখনই অনুভব করলাম রবীন্দ্রনাথকে :

“বাঁধলে যে-সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়
আজকে আমার তারে তারে বাজাও সে বারতা—।”

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি

মঞ্জুশ্রী দেবী

আজকে যাঁর নাম বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের এবং সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের কাছে এত আপনার, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আমি কিন্তু ছেলেবেলায় প্রথম জেনেছি আমার ঠাকুর্দারূপেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজছেলে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর সবার ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের ছোট ছিলেন আমার বাবা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তোমাদের মধ্যে যারা রবীন্দ্রনাথের জীবনী বা তাঁর নিজের লেখা "জীবনস্মৃতি" পড়েছ তারা নিশ্চয় জান যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার অনেকটাই কেটেছে তার মেজদা ও মেজবৌঠানের সঙ্গে। তখন তার নিত্যসঙ্গী ছিল দুটি ছোট ভাইপো ভাইঝি, আমার বাবা ও পিসিমা (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)। তাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই খুব ছেলেবেলা থেকে রবিদাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি ও জেনেছি। সেই ছেলেবেলার স্মৃতিরই দু-চারটে টুকরো তোমাদের কাছে পরিবেশন করছি, জানিনা কেমন লাগবে।

আমার যখন বয়স বছর বার, তখন বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তখনকার একটা ঘটনা বলি যার থেকে বুঝতে পারবে, যে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দ করতে তিনি কত ভাল-বাসতেন। একদিন সকালে রবিদার ঘরে গিয়ে আমি উপস্থিত। উনি বল্লেন, "আজ তো তোদের ছুটি। আয় আজ একটা নতুন কিছু করা যাক।" আমি বললাম, "কি করা হবে?" রবিদা বললেন, "আমি এখন কয়েকটা গান লিখছি, তোরা সেইমত সেজে

সেজে বিকেলে আসলি, গানের সঙ্গে বেশ মানাবে।" তাই হলো। সন্ধ্যায় আশ্রমের সবার সামনে দিন্‌দা ও তাঁর সঙ্গীরা রবিদার লেখা নতুন গান ধরলেন একের পর এক :

"মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের শেষে, এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই"

"তালের বনের করতালি কিসের তালে", "আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে," আরো কত কি। আর আমাদের মধ্যে রাণু (লেডী মুখার্জী বর্তমানে) সাজল মাধবী, সন্তোষবাবুর দুই বোন রেখা ও মুটু সাজল পূর্ণিমার চাঁদ আর তালগাছ, আমি হলাম সর্ষেক্ষেত। স্বপ্নের মত কেটে গেল সে সন্ধ্যাটা।

"গোরা" উপন্যাস তোমরা হয়ত কেউ কেউ পড়েছ আবার অনেকেই হয়তো পড়নি। আর একটু বড় হলে সবাই নিশ্চয় পড়বে। আমাদের কয়েকজনকে উনি পর পর বহুসন্ধ্যায় রোজ এক এক অধ্যায় করে "গোরা" থেকে নিজে পাঠ করে শুনিয়েছেন। বই তার অনেক আগে বেরিয়েছে। কিন্তু ওঁর মুখ থেকে "গোরা" পাঠ যে অপূর্ব আস্বাদ দিয়েছিল, পরে বড় হয়ে "গোরা" পড়ে সে অনুভূতি আর কখনও পাইনি। ব্যাখ্যা করতেন না, কিন্তু পড়ার সময়ই এমনভাবে পড়াতেন, এমনভাবে থামতেন, যে সেই পাঠের মধ্য দিয়েই সব কথা যেন হৃদয়ে গেঁথে যেত। ওঁর গল্পপাঠও একটা শিল্পসৃষ্টি।

তখন আমাদের গান শেখাতেন দিন্‌দা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। যেমন গলা তেমনই শেখাবার ক্ষমতা। দিন নেই রাত নেই রবিদার কাছ থেকে ডাক এলেই দিন্‌দা ছুটেছেন, নতুন গানের সুর তুলে নেবেন নিজের কণ্ঠে। সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের উনি ছিলেন জীবন্ত স্বরলিপি। যে গানটা নতুন শিখতুম, সেটা আমরা সারাদিন

গেয়ে বেড়াতুম। রবিদা তখন থাকতেন আমাদের বোর্ডিং-এর পাশেই। সেদিন শিখেছিলুম "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।" সারাদিন অবিশ্রান্ত গানটা গেয়েই চলেছি। খবর এল, রবিদা আমায় ডাকছেন। গেলাম। রবিদা বললেন, "হাঁরে, তোরা কি আমার আর কোন গান জানিস না? একটাই গান একশবার গাইছিস। আমার আর পথ চাওয়াতে যে একটুও আনন্দ হচ্ছে না", খুব লজ্জা পেলাম। তখন দেখি রবিদা হাসছেন, আমিও হেসে ফেললাম।

আমার যখন বয়স বছর চোদ্দ তখন রবিদার সঙ্গে বাবা আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। খুব ফুর্ত্তি, বিলেত চলেছি জাহাজে করে রবিদার সঙ্গে। পাশে রয়েছেন রথীকাকা ও প্রতিমাকাকী। প্রথম কদিন বেশ কাটল। তারপর উঠল।সমুদ্রের ঝড়। জাহাজে সে কি দোলা। বেশীর ভাগ লোক তো অসুস্থ হয়ে শুয়ে রইল যার যার ঘরে। কাকা ও কাকী একেবারে বিছানায়। ডাইনিংরুমে সেদিন ভারতীয়দের মধ্যে শুধু রবিদা আর আমি। ডেক থেকে খাবার ঘরে যেতেই পারছিনা, খালি হুমড়ি খাচ্ছি। তখন রবিদা বললেন, "তুই আমার জোব্বাটা শক্ত করে ধর, আমি তোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।" তাই হল। আমি ওঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। আর উনি ছ ফুট লম্বা দীর্ঘকায় পুরুষ সোজা হেঁটে, একটুও না টলে খাবার ঘরে এলেন আমায় টেনে নিয়ে।

জাহাজে আর একটা মজার ঘটনা ঘটে। বম্বে থেকে একজন গুণমুগ্ধ পার্শী ভদ্রলোক রবিদাকে এক বড় ঝুড়ি চমৎকার আম দিয়েছিলেন। রবিদা রোজ তার একটা দুটো খাবার টেবিলে আনতেন আর আমরা খেতাম। আমাদের পাশের টেবিলে খেতেন এক মেমসাহেব। তাঁর বোধ হয় সেই আমের গন্ধে রোজ জিভে

জল আসত। একদিন রবিদা খেয়ে দেয়ে একটু তাড়াতাড়ি উঠে নিজের কেবিনে গেছেন কি আনতে। আর দরজা খুলেই দেখেন যে সেই মেমসাহেব ঝুড়ি থেকে একটা আম বের করে প্রাণপণে খাচ্ছে। রবিদা তো লজ্জায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির। তারপর তাঁর কাছে লোভী মেমসাহেবের আম খাওয়ার গল্প শুনে আমাদের কি হাসি।

তিনি যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসতেন, তেমনই ছোট ছেলেমেয়েরাও তাঁকে অসম্ভব ভালোবাসত—শুধু এদেশে নয়, সর্বত্রই। বিলেতে বছর দেড়েক আমি একটা মেয়েদের ইস্কুলে পড়েছিলাম। সেখানে একবার রবিদা এসেছিলেন। ইস্কুলের সেই ইংরেজ মেয়েদের তাঁকে যে কি ভাল লেগেছিল কি করে বোঝাই! আমাকে তারা প্রায়ই বলত, "তোমাদের ঠাকুরদাকে আর একটি বার এখানে আসতে বল, ওঁকে আমাদের বড় ভাল লেগেছে।" মনে আছে রবিদাকে এ খবর জানাতে তিনি একটা খুব রসিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। অনেক কথাই মনে পড়ছে, কিন্তু যায়গা কম তাছাড়া এ সব ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা তোমাদের ভাল লাগছে কিনা জানিনা। তাই আর দুএকটি কথা বলে শেষ করছি। আমার বিয়েতে আচার্য ছিলেন রবিদা স্বয়ং। আর সেই উপলক্ষে একটি গান রচনা করে তিনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। গানটি তোমাদের হয়ত অনেকেরই চেনা: "ওগো বধূ সুন্দরী তুমি মধু মঞ্জরী, পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন"। শুভ্র বসনে আবৃত রবিদার সেই সৌম্য প্রসন্নমূর্তি কোনদিন ভুলব না। আর শেষ মনে পড়ছে, বাবার অসুখের সময় তাঁর আসার কথা। আশিতে পা দিয়েছেন, দীর্ঘ দেহ নুয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমার (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী) বয়স তখন প্রায় নব্বই। রবিদা এসে বললেন, "মেজবৌঠান চিনতে পারছো?"

দিদি (ঠাকুমা) উত্তর দিলেন, "তুমি তো রবি। তা এত রঙচঙে কাপড় পরে সেজেছ কেন?" রবিদা উত্তর দিলেন, "আজকাল তো আর সে পুরোনো দিনের রূপ নেই মেজবৌঠান, তাই রঙীন কাপড় পরেই লোকেদের মন হরণ করার চেষ্টা করি।" তারপর দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার সে কি প্রাণখোলা হাসি!

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাবা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেলেন। রবিদা লিখলেন—

"আজি জন্মবাসরের বক্ষভেদ করি
প্রিয়মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ।"

তার একবছর যেতে না যেতেই এল সেই যুগান্তকারী ২২শে শ্রাবণ। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যিনি চোখ মেলেছিলেন, সেইখানেই তিনি চোখ বুজলেন। তত্ত্বকথা আমি জানিনা, তাঁর বিশাল কীর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করার স্পর্দ্ধাও আমার নেই। তবে তাঁকে জেনে এইটুকু বুঝেছি যে তিনি ছিলেন মানুষের কবি, ভালবাসতেন ছোট ছেলেমেয়েদের, ভালবাসতেন এই পৃথিবীকে।

রাজার বাড়ি

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ছেলেটি আর মেয়েটি একসঙ্গে খেলা করত। দুজনেরই বয়স বছর সাত-আট। তার মধ্যে মেয়েটি ছোট। কিন্তু তার ভাবখানা ছোট নয়। অন্তত ছেলেটির ক্ষেত্রে তো নয়ই। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার সময় সে একটা ভারিক্কী চাল নিত। যেন সে সবজান্তা। যেন সে ঠাকুমা-দিদিমাদের দলের লোক।

ছেলেটি হাঁ করে, তার কথা শুনত। তার চোখে-মুখে থাকত অবাক ভাব। আশ্চর্য হতে তার জুড়ি ছিল না। যেদিকে তাকায় সেদিকেই অবাক হবার খোরাক পায় সে।

মাঘোৎসবের সময় বাড়ির উঠোনে কাঠেরথাম পোঁতা হয়। ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবে, পৃথিবীর ভেতরটা নিশ্চয়ই আরো সুন্দর —রূপকথার পাতালপুরীর মত। কত কী যে সেখানে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ছেলেটির ইচ্ছে হতো পৃথিবীর মেটে রঙের মলাটখানা খুলে ফেলে পৃথিবীর অন্দর-মহলে ঢুকে যায়। কিন্তু সে যে ছোট। তাই ইচ্ছাটা হতো, কাজটা হতো না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত, বড়রা কেন এই সামান্য কাজটা করে না।

আতার বিচি একটা যোগাড় করে সেটা মাটিতে পোঁতা হলো। আর রোজ তাতে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালা হতে লাগল। ঐ বিচিটা যে গাছ হয়ে যাবে! কী আশ্চর্য। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওরা চোখ মেলে সেই যায়গাটায়। আর আশা করে যে দেখবে একটা বেশ বড় ঝাঁকড়া আতাগাছ।

এ ছাড়াও ফুলগাছের চারা এনেও তার অতিরিক্ত যত্ন করা হয়।

যত্নটা প্রায় অত্যাচারের স্তরে পৌঁছত। নেহাতই গাছ বলে তারা প্রতিবাদ করত না, নীরবে সহ্য করত। সয়ে সয়েই তারা একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিত। ছেলেটি ভাবত, তাইতো, কী হোলো!

গুণদাদা সৌখীন লোক। তাঁর ছিল সুন্দর বাগান। সেই বাগানে ছিল নকল পাহাড়। এদেরও বুঝি ইচ্ছে করে না একটা নকল পাহাড় তৈরী করবার! আর সেটা করলে এদের পড়ার ঘরে এক কোণেই করতে হয়। সুতরাং গুণদাদার অজ্ঞাতসারে তাঁর পাহাড়ের পাথর কিছু সরে আসতে লাগল এদের পড়ার ঘরের এক কোণে। পুকুর চুরি নয়, প্রায় পাহাড় চুরি। ওরা পাহাড়ের কাছে গেল এবং পাহাড় ওদের সঙ্গ ধরে চলে এল পড়ার ঘরের কোণে। সেই পাহাড়ের পাহাড়তলিতে এরা বাস করত, চলত, ফিরত, পড়ত, ঘুরে বেড়াত।

এত বড় একটা ব্যাপার গুরুজনের কাছেও আনন্দের ও আশ্চর্যের ব্যাপার বলেই মনে হবে, এটা আশা করেছিল ওরা। কিন্তু গুরুজনরা যে কী রকম তা বোঝা মুস্কিল।

যেদিন ওরা আনন্দের ও আশ্চর্যের পাহাড়টিকে গুরুজনদের উৎসাহ নিয়ে দেখালো, সেইদিনই সেটার অন্তিম ঘনিয়ে এল। ঘরের কোণের পাহাড়-বাগান আবর্জনা-বোধে গৃহ-বিতাড়িত হলো। ওরা আশ্চর্য হয়ে ভাবল, 'আমাদের কাজের সঙ্গে বড়দের ইচ্ছের কত তফাৎ!'

এত ভাব দুজনের, এত খেলা একসঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি একটা যায়গায় ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যেত না। ছেলেটি হয়তো দুপুরে পাঠশালায় ব্যস্ত, তখন সে ঐ যায়গাটায় যেত। ছেলেটি ফিরলে বলত, 'আজ গিয়েছিলুম।'

ছেলেটি কৌতূহলী হয়ে উঠত, 'কোথায়, কোথায়?'

'সেইখানে।'

'কোনখানে?'

'সেই যে বলেছিলুম—'

'রাজার বাড়ি?'

'হ্যাঁ। রাজার বাড়ি।'

ছেলেটি মন-মরা হয়ে পড়ত। তার তো দেখা হলো না সেই আশ্চর্য রাজার বাড়ি। কত রূপকথায় সে শুনেছে রাজার কথা, রাজপুত্রের কথা, রাজকন্যার কথা; কত সময় মনে-মনে যে সে তাদেরই সঙ্গে কাটিয়েছে। চোখ বুঁজলেই যেন দেখতে পায় তাদের। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ার সাহসী সওয়ার। রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছেন। সোনার কাঠি আর রূপোর কাঠি একটু উল্‌টে রাখলেই স্বপ্নাচ্ছন্ন ছুটি চোখ মেলে জেগে ওঠেন। এঁরা সবাই তো থাকেন রাজার বাড়িতে, তার প্রতিটি ঘরের মধ্যে কত নতুন জিনিষ—কী সুন্দর আর কী আশ্চর্য! প্রতিটি ঘর তার দরজার মুঠো বন্ধ করে যেন বলছে, 'বলো তো, কী আছে।' ছেলেটা কত কিছু ভাবে; কিন্তু ঢুকলেই দেখা যায়, ভাবার চাইতেও সুন্দর সে ঘর। ঘর থেকে ঘর যত যাও শেষ হবে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে তারই একটা সুন্দর ঘরে তোমাকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তোমার ঘুমের মধ্যেও সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের ফুল ফুটে উঠবে। তুমি পাবে তার গন্ধ, পাবে তার স্পর্শ, শুনবে তার সুর। যখন জাগবে, চোখ খুলবে তুমি সেই আশ্চর্যের জগতে। আর সেখানে কি শুধুই বাড়ি! তা তো নয়। সে বাড়ি মস্ত বড়, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় তার বাগান-পাহাড়-নদী-ঘেরা চৌহদ্দি। যত দূর হাঁটো শেষ হবে না কিছুতে। পাহাড় তো পাহাড়। কত যে পাহাড় তার শেষ নেই, আর কত যে বড় তাও তুমি ঠিক ঠাওর করতে পারবে

না। গুনদাদার পাহাড় তো ছোট—এইটুকখানি। অমন দশটা-বিশটা পঞ্চাশটা নিয়ে তার এক একটা। সেখান থেকে পাথর নিলে কেউ কিছু বলে না। সে পাহাড়ে ঝর্ণাও আছে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বোসো সেই ঝর্ণার পাশে। শোনো ঝর্ণার ঝির-ঝির শব্দ। দুটো-একটা নুড়ি তুলে নাও, ছাখো সেগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তারপর জল খেয়ে আবার চলতে সুরু কর। চল আর ছাখো। সে কিন্তু ফুরোবে না। সে রাজার বাড়ি যে কত বড় তা কেউ জানে না। খুব বড়—এটুকু বলা যায়। কত বড়। ও বাবা! তা কি জানি!

ছেলেটি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় সে রাজার বাড়ি?'

মেয়েটি বলে, 'এই তো—'

'আমাদের বাড়ির বাইরে?'

'না। আমাদের বাড়ির মধ্যেই।'

'আমায় একদিন নিয়ে যাবি?'

'ও বাবা!'

এর পর আর কথা বলা যায় না। কেন যে 'ও বাবা' তা জিজ্ঞেস করতেও বাধে।

দিন চলতে থাকে।

ছেলেটি ভাবে, একদিন মেয়েটির রাজার বাড়ির পথে তার সঙ্গ নেবে, চলে যাবে তার সঙ্গে। কিন্তু তা হয় না। মেয়েটি বেছে বেছে এমন সময়ে সেখানে যায় যখন ছেলেটি হয় ইস্কুলে গেছে নয় তো মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে বসেছে।

তাছাড়া, যাওয়ার আগে কোন সময় বলে না মেয়েটি। ঘুরে এসে বলে, 'আজ সেখানে গিয়েছিলুম।'

'সেই রাজার বাড়ি!'

'হ্যাঁ।'

'কি কি দেখলি সেখানে, বল না আমায়।'

মেয়েটি বলে যায় সেই রাজার বাড়ির কথা। সেখানে পক্ষীরাজ-চড়া রাজপুত্র থাকে, থাকে সোনার পালংকে রাজকন্যা। আছে আশ্চর্য ঘর, পাহাড়, ঝর্ণা, আরো কত কি!

চোখ বড় বড় করে শোনে ছেলেটি। আর ভাবে, মেয়েটির কী আশ্চর্য সৌভাগ্য।

লোভীর মত আবার বলে ফেলেছে, 'আমায় একদিন নিয়ে যাবি সেখানে?'

'ও বাবা।'

'ও বাবা' যে কেন তা বলে না। অথচ এমন একটা ভাব করে যে ছেলেটি আর জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। তার পথে 'ও বাবা'—র বাধা চিরন্তন হয়ে থাকে।

শুধু এক একদিন ছুটির দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে চোখ মেলে জানলায় বসে থাকতে থাকতে তার মনে সেই রাজার বাড়ির ছায়াটা ভেসে ওঠে। আছে, আছে, এই কাছেই কোথাও আছে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেন সে বাড়ির সাড়া ভেসে আসে বাতাসে, কিন্তু কেমন যেন হারিয়ে আছে। হয়তো এই রোদ্দুরের আঁচলের ঐ দূর প্রান্তটা, যেটা দেখা যায় কাঁপছে এই মধ্য-দুপুরে, যদি একটানে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে রাজার বাড়ি জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে। ঠিক যেমন থিয়েটারের সময় পর্দাখানা টেনে নিলে কত কিছু দেখা যায়, তেমনি।

যদি সে যেতে পারত ঐখানটায়, যেমন যাচ্ছে রাস্তার ঐ লোকটা। কাঁধে তার লাঠি, লাঠির ডগায় একটা পুঁটুলি

বাঁধা। পায়ে ধূলো। সে রোদ্দুর ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে, যাচ্ছে ঐ রোদ্দুরের আঁচলের কাঁপা-কাপা দূর প্রান্তে।

কিংবা অত দূরেই বা যেতে হবে কেন! মেয়েটি তো বলেছে, সে জায়গাটা এ বাড়ির মধ্যেই। আশ্চর্য হয়ে যেত ছেলেটি। এ বাড়ির সব ঘরই তো সে দেখেছে। তবে কি হঠাৎঅজান্তে বাদ পড়ে গেল সেই আসল ঘরটা? দুপুরবেলা, সে বারান্দা ধরে একের পর এক ঘর দেখে বেড়িয়েছে। সব ঘরই অতি পরিচিত, তবু প্রতিটি ঘরে ঢোকবার মুখে মনে হয়েছে, বোধহয় নতুন কিছু দেখবে।

ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল। অসুখ-বিসুখ বিশেষ করে না। তবু এক-আধ দিন একটু ঠাণ্ডা লেগে যখন সর্দি আর জ্বর-জ্বর ভাবটা হয়, তখন গুরুজনের হুকুমে একটা ঘরে একটা শয্যায় বন্দী হয়ে থাকতে হয় তার। তখন মনে হয় এই ঘরটার বাইরে বেরোলেই সেই রাজার বাড়ির দেখা মিলে যাবে।

রাতে এক-আধ দিন হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙ্গে যেত ছেলেটির, সারা বাড়ি নিঝ্ঝুম, বাইরে দুটো একটা গাছের পাতা বাতাসের সঙ্গে ফিসফিস করছে, তখন তার মনে হতো, গোটা রাজার বাড়িটা ঠিক তার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সেই রাজার বাড়ির কথাবার্তা ও হাসি-গানের টুকরোগুলো টুংটাং শব্দে বয়ে চলেছে—তারই দরজার ঘাট দিয়ে। ছবির পর ছবি তার মনে জাগত। দরজার পাল্লাটা খুললেই সেই ছবিগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

উঠে দরজার বাইরে যাবে, এটা ভাবতে ভাবতেই ঘুমে ছেলেটির চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—সেই রাজবাড়ির স্বপ্ন। যেন সে গিয়েছে সেখানে। স্বপ্নগুলো এত সত্যির মত যে জেগে উঠেও বেশ কিছুক্ষণ যায় ভুলটা ভাঙ্গতে। আর মনটাও খারাপ হয়ে যায়।

তাই আবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'এখনও যাস্ তুই?'

'হ্যাঁ।'

'আমায় একদিন নিয়ে যাবি?'

'ও বাবা!'

তারপর মেয়েটি বড় হয়। সুন্দর সাজে সেজে সে স্বামীর বাড়ি যায়। যাওয়ার সময় কাঁদে—বোধহয় রাজার বাড়ি ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

ছেলেটাও বড় হয়। অনেক বড়। যশ মান কিছুরই অভাব থাকে না। কত জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা কেউই তো রাজার বাড়ির খোঁজ জানে না।

ছেলেটা বড় হয়ে ছবি আঁকে, গান বাঁধে, কবিতা লেখে, গল্প বলে, নাটক করে, আর সবের মাঝেই কোন কোন সময় মনে পড়ে সেই না দেখা রাজা আর রাজবাড়ির কথা।

অনেক জ্যান্ত রাজা সে দেখে, অনেক রাজার প্রাসাদে সে যায়, কিন্তু সেই ছোটবেলার না দেখা রাজার বাড়িতে—ও বাবা!*

*"বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলারসঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, 'আজ সেখানে গিয়াছিলাম।' কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য যায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে। একতলায় বা দোতলায় কোন একটা যায়গায়। কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছি, 'রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?' সে বলিয়াছে, 'না, এই বাড়ির মধ্যেই।' আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।"—রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', পৃঃ ১৪। তাছাড়াও দ্রষ্টব্য, 'শিশু' ও 'গল্পসল্পে'র 'রাজার বাড়ি'।

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান

মনোজিৎ বসু

বাংলা শিশুসাহিত্যে বা ছোটদের উপযোগী বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অফুরন্ত না হ'লেও প্রচুর। আর সে দানে বাংলা শিশুসাহিত্য সুসমৃদ্ধ। কোনো এক রকমের ছাঁচে গড়া সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য আখ্যায় অভিহিত করলে ভুল হবে। কারণ, বালক ও কিশোর মনের আনন্দানুভূতি কখনও নির্দিষ্ট কোনো পথ ধরে চলে না। সে মন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনি তার কৌতূহল জাগে আলোর ঝলকানিটা কেন হ'লো, এলো কোথা থেকে। রূপকথার অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়ে সে মন যেমন পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি আবার বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার গল্প-কবিতাতেও আনন্দ পায়। তাই যে সব ছড়া, গল্প-কবিতা, রূপকথা, উপকথা, নাটক-নাটিকার মধ্য দিয়ে বালক ও কিশোর মন সহজ ও স্বাভাবিক আনন্দানুভব করে, তার কল্পনাশক্তির স্ফূর্তি ও পূর্তি ঘটে, সেই ধরণের সাহিত্য-সম্ভারকেই আমরা শিশু-সাহিত্য বা ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের এমন বহু ছড়া ও কবিতা আছে যেগুলিকে বাংলা শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। শিশু যখন প্রথম বই পড়তে শেখে তখন তাকে ছড়ার মাধ্যমেই বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের সঙ্গে পরিচিত করাবার রীতিটাকেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-সম্মত ও বাস্তবসম্মত ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর এই কারণেই তাঁর 'সহজ পাঠ' কোমলমতি বালক-বালিকাদের কাছে এত প্রিয়। ছোটদের কাছে প্রাথমিক অবস্থায় শব্দের অর্থগৌরবের

বিশেষ মূল্য নেই, তাদের কান থাকে শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের দিকেই। ছড়া আর ছড়ার ছন্দেই শিশুচিত্ত প্রথমে দোলায়িত হয়ে, পরে একটু একটু ক'রে গল্প শোনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই কারণেই সর্বকালে সর্বদেশে 'নার্শারী রাইম্'-এর মধ্য দিয়ে পাঠ-পরিচয় হয়। 'নার্শারী রাইম্', আর আমাদের দেশের 'ছোটদের ছড়া' একই জিনিস। রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এর 'নার্শারী রাইম্' এদেশের ছোটদের মুখে মুখে ফেরে।

কিন্তু শিশু যখন আর একটু বড় হয়, অর্থাৎ বালকত্ব বা কৈশোরের গণ্ডীর মধ্যে যখন সে ঘোরাফেরা করে, তখন তাকে শুধু ছড়া দিয়ে আর ভুলিয়ে রাখা যায় না। তখন তারা চায় গল্প, কবিতা কৌতুককর কাহিনী। কিশোর-মনের অপূর্ব ভাববৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এমন এক কল্পনাপ্রধান সাহিত্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থের নাম। ছোটদের বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি মেলা ভার। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের রসানুভূতির ক্ষমতা একমাত্র কিশোরদেরই আছে, শিশুদের পক্ষে সেই রসাস্বাদন সম্ভব নয়। আরও অনেক গল্পের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর পাঠকদের আনন্দ দিয়েছেন। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি যেমন বারবার প'ড়েও ছোটরা নতুন ক'রে পড়ে।

শিশুদের কাছে যেমন ছড়ার আদর, কিশোরদের কাছেও তেমনি। 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটিকে সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত

নয়।" এই 'ছড়ার ছবি'-গ্রন্থের ছড়াগুলিকে বাংলা শিশুসাহিত্যের এক আনন্দের খনি বলা যেতে পারে। এই খনি থেকেই ছোটরা পরমানন্দে আহরণ করে :

"নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা' ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যবসা করে ভাগ্‌নে আমার বলাই
তার আড়তে আসব বেচে ক্ষেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিন পোয়া,
যদু ঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।"

কিংবা.

"ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাত্‌রাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি দংশনে।
দিব্যি চল্‌ছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া,—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর,—
জোড় হাতে কয় রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর।
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জম্‌কালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তার দেখে চরের ঘনাল সন্দেহ,
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়
ওরে বাস্‌রে, দেখেনি সে আর কোনো জায়গায়।"

অথবা, 'মা কাল'-এর বর্ণনায়

"দোয়াত-কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায়,
লেখাপড়ায় মন দেখে' মা অবাক্ হয়ে যায়।

খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু—"মাকালচন্দ্র রায় ॥"

শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ সচেতন। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'ছুটির পড়া' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁর সেই সচেতনতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে শিশু মন কখনও আটক থাকতে চায় না, পাঠ্যপুথি পড়তে পড়তে সে-মন যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন সে চায় ছুটি। মায়ের কাছে গিয়ে 'শিশু' তখন বলে—

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে ব'সে
করব শুধু পড়া পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হ'লো তাই,
একদিনও কি দুপুরবেলা হ'লে
বিকেল হ'লো মনে করতে নাই ?"

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিশু মনের বিচিত্র ও সহজাত ভাবধারার যে পরিচয় লাভ করা যায় তা সার্বজনীন শিশুমানসেরই পরিচয়। পড়ার চাইতে শিশু খেলাটাকেই বড় ক'রে দেখে, অথচ পড়তে যে সে চায় না এমন নয়, কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের বক্তব্য সে আয়ত্ত করতে চায় খেলার মধ্য দিয়ে। শিশুমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে রাজী নয়, সে চায় নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, তার মা কেন একদিনের জন্যও দুপুরবেলাকে

বিকেলবেলা বা অবসরক্ষণ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন না ? প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেও শিশুমন যেন বহু গলদ ও ব্যতিক্রম আবিষ্কার করে। শিশু জানে মায়ের কাছে তার মতো আদরের ধন আর কিছু নেই, এবং তার কাছেও মায়ের মতো প্রিয়জন আর কেউ নেই। তাই, যে-কুকুরছানা শিশুর নিত্য সঙ্গী, ভালোবাসার বস্তু, সেই কুকুরছানার প্রতি যখন মায়ের অনাদর লক্ষ্য করে, শিশুর তখন যেন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কুকুরছানার জায়গায় নিজেকে কল্পনা ক'রে শিশু তখন তার মাকে প্রশ্ন করে—

"যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা-
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিয়ে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি ক'রে বল্
আমায় করিস্ নে মা ছল,
বল্‌তে আমায় 'দূর দূর দূর !
কোথা থেকে এল এই কুকুর' ?"

মাকে নিরুত্তর দেখে শিশু তখন ব্যথাতুর মনে অভিমান ভরে ব'লে ওঠে—

"......যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে
আমি খাব না তোর পাতে॥"

গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি শিশুর এই যে সমব্যথা তা চিরন্তন। শিশুর মনের সাধও বিচিত্র। রোজ দশটায় সে যখন বইপত্তর নিয়ে

পাঠশালা বা স্কুলের দিকে পা বাড়ায়, তখন দেখতে পায় তাদেরই গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা মাথায় ঝাঁকা চাপিয়ে, হেঁকে যাচ্ছে 'চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই' ব'লে। শিশু ভাবে, এ তো বেশ মজা। ফেরিওয়ালা তার নিজের ইচ্ছামত যখন তখন কেমন এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়ায়, যখন খুশি বাড়িতে গিয়ে খায়; তারকিন্তু—'দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে'—ব'লে কোনো তাড়া নেই। বন্ধনহীন এই সহজ জীবন তাই অতি সহজেই শিশু মানসে রেখাপাত করে। সে তখন ব'লে ওঠে—

"ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি ক'রে বেড়াই নিয়ে ফেরি।"

শিশুদের একটা বড় দুর্বলতা থাকে, তা হলো নিজেদের বিজ্ঞতা সম্পর্কে। ছেলেমানুষ বলে বড়রা তাদের হটিয়ে দিতে চাইলেও, তারা নিজেরা কিন্তু নিজেদের ছেলেমানুষ বলে ভাবতে রাজী নয়। সর্বদা তারা বড়দের অনুকরণ করে বিজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্যটুকু তাঁর অনেক কবিতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'শিশু'কে এক জায়গায় তাই বলতে শুনি—

"খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝো না মা,
খুকী তোমার ভারী ছেলেমানুষ!
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়ে ছিলাম ফানুস।"

কিংবা "সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি—'আসছে বাবা'—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়
তোমার খুকী এমনি বোকা হাবা।"

ছোট বোনের ওপর দাদার এই আধিপত্য শিশুমনস্তত্ত্বের একটা বড় দিক। এই আধিপত্যের মধ্যে কিন্তু স্নেহের ফল্গুধারাটিও বয়ে চলে ; তার প্রকাশ তো তার কথার মধ্যেই—'খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা !' কিংবা 'খুকী তোমার এমনি বোকা হাবা !'

শিশুর জগৎ জননীময়। মা-কে বাদ দিয়ে শিশু যেন কোনো কিছু কল্পনাই করতে পারে না। তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা সব কিছুই তার স্নেহময়ী জননীকে কেন্দ্র করে। তাই, মায়ের মুখখানি ভার দেখলে শিশু ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই মুখভারের কত না কারণ সে খুঁজে বেড়ায় চতুর্দিকে। আকুল হয়ে তাই শিশু বলে—

"অমন করে আছিস কেন মাগো,
খোকা রে তোর কোলে নিবি নাগো ?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী যে ভাবিস অন্যমনে
এখনও তোর হয়নি চুল বাঁধা !"

কিংবা, "ঐ তো গেল চারটে বেজে
ছুটি হ'লো ইস্কুলে যে
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি ?
বেলা অমনি গেল বয়ে
কেন আছিস অমন হয়ে
আজকে বুঝি পাসনি বাবার চিঠি ?"

শিশু সাহিত্যের এই জাতীয় কবিতা যে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে তার আবেদন শুধু ছোটদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও। রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। সার্বজনীন আবেদনের স্পর্শমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যকে চিরসমৃদ্ধ করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ

বিমল কর

রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখি নি। ইচ্ছে থাকলেও দেখা হয় নি কখনও। তারপর তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন। মনে হত, কেন একবার দেখে এলাম না। আফশোস হত খুব। পরে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, তুমি ত কত কিছুই দেখ নি; সমুদ্র না, পাহাড়ও নয়। তা বলে চোখ বুঝলে কি সমুদ্রের ছবি দেখতে পাও না! সবাই কি আর জাহাজে করে সমুদ্র ঘুরে এসেছে, না পাহাড় ডিঙিয়েছে, তবু সমুদ্র পর্বত কার চোখে না ভাসে।

আরও কিছুকাল পরে এক গল্প শুনেছিলাম। এক ছিল অন্ধ। তার বড় সাধ ছিল সূর্য দেখে। সূর্য দেখতে পেত না বলে ভীষণ কষ্ট তার। একদিন আর এক অন্ধ তাকে বলল, সূর্য না দেখার জন্যে অত কষ্ট কিসের তোর; দিনের বেলায় বাইরে গিয়ে দাঁড়া, গায়ে মাথায় রোদ পাবি, তাপ পাবি। যদি রোদ আলো তাপ পাস তবে আর কষ্ট কিসের তোর!

কথাটা খুব খাঁটি। রবীন্দ্রনাথ ওই সূর্যের মতন। সবাই তাঁকে দেখার ভাগ্য করে নি। কিন্তু ওই সূর্যে রোদ তাপ আলো না পাচ্ছে এমন মানুষ বাঙলা দেশে নেই। আমরা কত ভাগ্যবান এ-কথা আজ বুঝি।

খুব ছেলেবেলায় যখন সারা দিনই ইজের সামলাতে ব্যস্ত তখন দিদির মুখে ছড়া শুনেছি: 'দিনের আলো নিভে এল সূর্য ডোবে ডোবে,'...শুনেছি আর মনে মনে মুখস্ত করেছি। আরও একটু বড় হলে বইয়ের পাতায় পড়লাম, 'বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার

মেলা...' ; তারপর এক একটা ক্লাস টপকাই আর কখনও পড়িঃ 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে....' কখনও বা 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে...'। এই ভাবে যত বয়স বাড়ে পড়া বাড়ে তত, বুঝি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কোন অমূল্য ধন।

মস্ত বিদ্বান হয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা তন্ন তন্ন করে পড়ব বুঝব— এমন মানুষ থাকবে কিছু। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ অত বিদ্বান হবে না। তারা হবে সাধারণ মানুষ, কেউ মাষ্টার, কেউ কেরাণী, কেউ বা দোকানদার। কিন্তু এই বাঙলাদেশের সব মানুষকেই ওই সূর্যের আলো গায়ে মাখতে হবে। না মেখে উপায় নেই। একেবারে যে শিশু তাকেও আজ 'কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি' দিয়ে মায়ের ভাষাটি শিখতে হয়। তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে আধো আধো গলায় গান গায়ঃ 'বাঙলা দেশের হৃদয় হতে...'। সত্যিকথা বলতে কি, আজ আমরা এমন আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে রবীন্দ্রনাথ দিন দুপুরের আলো! এ-আলোর শেষ নেই, সীমা নেই।

সেই ছেলেটার গল্প

মতি নন্দী

রবীন্দ্রনাথের লেখা একটা গল্পই বলি। তার আগে একটা ছবি দেখাই।

নদীটা মস্ত ছিল কিন্তু এখন মরা। বিস্তর দাম জমেছে তার বাঁকে, বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে, দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে, আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল—বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে, বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা, পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।

এ রকম একটা ছবির মধ্যে যদি দুপুরবেলায় গিয়ে পড়ি তাহলে আমারই জলের ঝিলমিলি দেখে ডুব দিতে ইচ্ছে করবে, বছর দশেকের ছেলেটাকে দোষ দিয়ে লাভ কি! জলের তলায় সবুজ, স্বচ্ছ, সাপের চিকণ দেহের মতো স্যাওলাগুলো পাতা ছড়িয়ে দুলছে, মাছ খেলা করছে, শুনেছি তার তলায় নাকি নাগকন্যারা আছে, সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল, তারই আঁকাবাঁকা ছায়া জলের ঢেউয়ে।

কাজেই দশবছরের সেই ছেলেটা দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে। ভাগ্যিস চেঁচিয়ে উঠেছিল, তাই না শুনে গোরুচরাতে চরাতে রাখালরা ছুটে এল, জেলেডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তো তাকে ডাঙায় তুলল, তখন সে নিঃসাড়।

এরপর অনেকদিন ধরে তার মনে পড়েছে মায়ের কথা। সেই কবে, যখন সে এতোটুকু তখন মাকে হারিয়েছে। জলের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে যখন সবকিছু কালো হয়ে আসছিল, চোখের সামনে

যখন উজ্জ্বল সুন্দর রঙবেরঙের আলো ফুটতে শুরু করল, তখন, শুধুমাত্র তখনই সে ভাবল অত্যন্ত প্রিয়, ভীষণ আপনার, খুব ভালো, ভারী মিষ্টি একটা কিছুর কথা। অমনি তখনি সে ভেবেছিল মায়ের কথা। তাছাড়া আর কিই বা সে ভাবতে পারে। মানুষ হয়েছে পরের ঘরে। কেমন করে সে দশবছরেরটি হয়ে উঠল? কেন, মালীর যত্ন ছাড়াও তো বেড়ার ধারে আগাছা বড়ো হয়। আলো, বাতাস, বৃষ্টি, পোকামাকড়, ধূলোবালির মধ্যে অবহেলায় অযত্নেও তো গাছ বড়ো হয়, কাণ্ড হয়ে ওঠে, ডাঁটা মোটা হয়, পাতা হয় চিকণ সবুজ,—এই ছেলেটাও তো ঠিক তেমনি আগাছার মত।

বোধহয় স্নেহ যত্নের অভাবেই ছেলেটা হয়ে উঠল দুর্দান্ত দামাল। এই কুল পাড়তে উঠে পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙছে, আবার বুনো বিষফল খেয়ে ভির্মি যাচ্ছে; বক দেখতে গিয়ে একবারতো হারিয়েই গেল। এজন্য মার খায় দমাদম, গাল খায় অজস্র, আবার ছাড়া পেলেই দে দৌড়। কিছুতেই ওর কিছু হয় না।

বক্সিদের বাগানে গুড়িসুড়ি দিয়ে যায় জাম চুরি করে খেতে। ধরা পড়ে মার খায়। তাব মারের থেকেও জামটাই সে বেশি খেয়েছে। বাড়ির লোকে বলে, "লজ্জা করে না বাঁদর?" কিন্তু ছেলেটা বোঝে না এতে লজ্জার কি আছে! বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে, ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়, গাছের ডাল ভাঙে, ফল নষ্ট করে, কই তার তো লজ্জা করে না?

একদিন পাকড়াশিদের মেজোছেলে একটা কাচপরানো চোঙ নিয়ে এল। ছেলেটা চোঙের মধ্যে তাকিয়ে দেখলো নানা রঙ সাজানো। নাড়া দিলেই রঙগুলো ওলট-পালট হয়ে নতুন হয়ে যায়। খুব ভালো লাগল। ব্যস অমনি, "দে-না ভাই, আমাকে।

তোকে আমার ঘষা ঝিনুক দোব, মজা করে কাঁচা আম ছাড়াবি। আর দেব আঁটির ভেঁপু।" কিন্তু পাকড়াশিদের ছেলে কেন রাজি হবে? সে দিল না। ছেলেটা লোভে পড়ে চায়নি। ঘরে জমিয়ে রাখার জন্যও নয়, ওর উদ্দেশ্য, চোঙটার ভিতরে কি আছে, কেন নাড়া দিলেই রঙ বদলায়, সেই রহস্যটুকুই খুঁজে বার করতে চায়। না পেয়ে, তাই চুরি করে আনল। খোদনদাদা কান ধরে বলল, "চুরি করলি কেন?" জবাবে সে বলল, "ও কেন দিল না?" ভাবখানা এমন যেন চুরির দায়টা ওর নয়, পাকড়াশিদের ছেলেরই।

ছেলেটার দুষ্টুমির রকমও বলি। শরীরে ভয় বা ঘেন্না বলেতো কিছু নেই। বাগানে খোঁটা পোঁতার গর্ত আছে। তারমধ্যে, হাত দিয়ে এক বিচ্ছিরি কোলাব্যাঙ ধরে পুরে রেখে দিল। ওটাকে সে পুষবে। পোকামাকড় ধরে এনে ব্যাঙটাকে খেতে দেয়।

কাগজের বাক্সোয় গুবরে পোকা এনে রাখে। সেটাকে খেতে দেয় গোবরের গুটি। ফেলে দেবার জো নেই, তাহলেই অনর্থ বাধবে। পকেটে কাঠবেড়ালি নিয়ে ইস্কুলে যায়। একদিন মাষ্টারমশায়ের ডেস্কের মধ্যে একটা হেলে সাপ এনে রাখল। উদ্দেশ্যটা হল, ভয় পেয়ে তিনি কি করেন সেইটা দেখা। ডেকসো খুলেই তো ভদ্রলোক দিলেন এক লাফ, তারপর পরিত্রাহি দৌড়।

এ হেন দুষ্টু ছেলেটার একটা পোষা কুকুর ছিল। বিলিতি-টিলিতি নয় একদম দিশি জাতের। চেহারা মনিবেরই মতো কালো-কোলো। ব্যবহারটাও তাই। খাওয়াটা প্রায়ই জুটত না, সুতরাং চুরি করে খাওয়া ছাড়া গতিও ছিল না। কুকুরটার একটা পা যে খোঁড়া তা ওই চুরি করতে গিয়েই হয়েছে। যারা খোঁড়া করেছিল, তাদের শসাক্ষেতের বেড়াও অবশ্য আর আস্ত থাকেনি।

কুকুরটা ঘুমোত মনিবের বিছানায়, তার সঙ্গে না শুলে

মনিবের ঘুমই আসে না। একদিন প্রতিবেশীর ভাতের থালায় মুখ দিতে গিয়ে কুকুরটা এমন মার খেল যে মরে গেল। ছেলেটা অনেক মার, অনেক দুখ্যু সয়েছে, কিন্তু কখনো চোখে একফোঁটা জল দেখা যায়নি, অথচ কুকুরের শোকে দু'দিন সে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো, মুখে অন্নজল রুচলো না। বক্সিদের বাগানের পাকা করমচার দিকেও তাকাল না। তবে, যারা মেরেছে তাদের সাত বছরের ভাগ্নের মাথায় এক ভাঙা হাড়ি চাপিয়ে দিয়ে এল।

সিধু গয়লানির ছেলে সাতবছর আগে মারা গেছে। ছেলেটার থেকে তার বয়সের তফাৎ ছিল তিন দিনের। দেখতেও ছিল এক রকমের। গয়লানি তাই ওকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায়। ওরও দৌরাত্মি এই গয়লানি মাসির উপর। বাঁধা গরুর দড়ি কেটে দেয়, ভাঁড় লুকিয়ে রাখে, খয়েরের রঙ কাপড়ে লাগিয়ে দেয়। এ সবই করে কিন্তু একটা উদ্দেশ্যে। তা হল 'দেখি-না কী হয়' এই কৌতুহল মেটাবার জন্য। যত উপদ্রব বাড়ে, তারজন্য ছেলেটাকে কারুর শাসন করার জো নেই।

ছেলেটার গল্প বললাম। এবার বলি রবীন্দ্রনাথের কথা। এই ছেলেটা অর্থাৎ যে 'দেখি-না কী হয়'-এর পরীক্ষা সব সময়েই করে, তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করে গেলেন অম্বিকে মাষ্টার। দুঃখ করে বললেন, "শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতা-গুলো পড়তে ওর কিছুতেই মন লাগে না, এমন নিরেট বুদ্ধি। পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে কেটে রেখে দেয়, বলে ইঁদুরে খেয়েছে, এতো বড়ো বাঁদর।"

শুনে রবীন্দ্রনাথ কী করলেন? রাগ করলেন? না, দুখ্যু পেলেন? হ্যাঁ, সারাজীবন ধরেই তো তিনি সকলের মনের কথা বলতে

চাইছেন, কিন্তু পারছেন কই। যে কাঁপনে গাছের পাতা থেকে বৃষ্টিজলের মত সুখদুঃখ, ভালবাসা, এমনকি এই ছেলেটির দুষ্টুমি আর কৌতূহল ঝরে পড়ে, সেই কাঁপনটুকুই যে তিনি অনুভব করতে পারছেন না। তাহলে কি করে তিনি এই ছেলেটীকে তাঁর কবিতা ভালো লাগাবেন! তাঁর সাধনা যে এই দুষ্টুছেলেটার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তিনি তো তারও কবি হতে চান। তাই অম্বিকে মাষ্টারের কথার জবাবে তিনি বললেন, "সে ত্রুটি আমারই। থাকত ওর নিজের জগতের কবি, তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে যে, ও ছিঁড়তে পারত না। কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে—আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডী!"

খুব আশ্চর্যের কথা না? মানুষকে জানার জন্য আমরা যার লেখা পড়ি তার মুখেই কিনা এমন কথা! কিম্বা এমনও হতে পারে মানুষ সম্পর্কে এইটাই আসল কথা,—সে এতরকমের যে তার সম্পর্কে কিছুই লেখা যায় না।

অমলের পাখি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ দরজা খুলে অন্তু বললে, "এই দেখ অমল, সেই পাখিটা ধরেছি !"

অমল তখন একমনে বসে খাঁচা বানাচ্ছিল। অন্তুকে দেখে ওর মুখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললো, "তুই ধরে ফেললি অন্তু ! শুধু শুধু আমি এত কষ্ট করে খাঁচা বানালুম।"

অন্তু মুঠো করে পাখিটার দুটো ডানা চেপে ধরেছে। আনন্দে ওর চোখ দুটো দু' টুকরো রোদ্দুরের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। আজ ওদের ইশ্‌কুল ছুটি। গ্রামে কে যেন একজন মস্ত বড় মানুষ এসেছে সেইজন্য। সারা দুপুর বাগানে ঘুরে, এ গাছ সে গাছের মগ্‌ডালে চড়ে অতিকষ্টে ধরেছে পাখিটাকে। অমল পাখিটাকে ধরবার চেষ্টা করেনি। আগে বসে বসে খাঁচা বানিয়েছে। যদিও পাখিটা অমলই প্রথম দেখেছিল।

—"এটা কি পাখি রে ?" অন্তু জিজ্ঞেস করল।

—"জানিনা।" অমল বলল। "আমাকে পাখিটা দিবি ?"

—"ইস্ ! কত কষ্ট করে ধরেছি, আর…"

অমল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পাখিটার দিকে। দূর থেকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল—কিন্তু পাখিটা যে এত সুন্দর—সে ভাবতেই পারেনি। দুধের মত সাদা রঙ, ঘুঘু পাখির চেয়ে একটু বড় পায়রার চেয়ে একটু ছোট। টিয়া পাখির মতন দীর্ঘ বাঁকানো লাল ঠোঁট। পাখিটা যেন ভয় পেয়ে অবাক হয়ে গেছে। অমল এত সুন্দর পাখি আগে কখনও দেখেনি।

"—দে ভাই অন্তু পাখিটা আমাকে", অমল মিনতি করে বলল, "তার বদলে তুই যা চাস দেব। আমার জলছবি খাতাটা নিবি, কিংবা এক ডজন কাঁচের গুলি কিংবা রোদ্দুরের চশমাটা?"

—"না, চাইনা, পাখি দেব না!" অন্তু সোজা জবাব দিয়ে দিল।

—"কিন্তু, তোর তো খাঁচা নেই। তুই কোথায় রাখবি?"

—"যেখানে ইচ্ছে। আমি কি তোর মত, পাখি না ধরেই খাঁচা বানাবো?"

"আচ্ছা, পাখিটা-একবার ধরতে দে।"

অমল কাছে এসে পাখিটার গায় হাত দিল। অমনি পাখিটা ঝটপট করে উঠতেই অন্তুর হাত ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা পাখি আনন্দে একবার সারা ঘরটা ঘুরে জানলা দিয়ে টুপ করে বেরিয়ে গেল। প্রথমে দুজনেই চমকে গিয়েছিল—তারপরই অমল -অন্তু ছুটে বাইরে এল ঘর থেকে। রান্না ঘরের চালে বসেছে। সেখান থেকে তেতুলগাছের মাথায়। তারপর ফুরফুর করে উড়ে আরও দূরে চলে গেল।

ছুট্ ছুট্ ছুট্। ওরা দুজনে ছুটলো পাখির পিছু পিছু। পাখি উড়তে উড়তে এল ছোটখালটার পারে। তারপর কয়েকবার অদ্ভুত ডাক ডেকে চক্কর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চলে গেল খালের মাঝখানে। সেখানে একটা বজরা নৌকো ছিল। পাখিটা তার জানলা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল।

অমল আর অন্তু খালেরপারে দাঁড়িয়ে রইল বজরাটার দিকে তাকিয়ে। বজরা নৌকো একরকম ছোটখাট বাড়ির মত। তার ঘর আছে, ছাদ বারান্দা সব আছে। এ বজরাটা কার ওরা জানেনা। গ্রামে নতুন এসেছে।

—"তোর জন্যই আমার পাখিটা উড়ে গেল!"

"পাখিটা তোর কি, আমার। আমিই তো আগে দেখেছি। তা ছাড়া আমি ওর জন্য খাঁচা বানিয়েছি। তুই কি করেছিস ওর জন্যে ?"

—"কষ্ট করে গাছে উঠে ধরল কে ? তুই ধরতে পারতিস্ ?"

শেষের প্রশ্নে অমল একটু দমে গেল। ও গাছে উঠতে পারে না। গাছে ওঠা ওর বারন। গত বছর ওর খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল।

দুপুরবেলা চারদিক নিঝুম। কোথাও জন-মানুষ নেই। বজরাটা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে একটা মাছরাঙা পাখি ঝুপ্ ঝুপ করে জলে ডুব দিচ্ছে।

—"চল্ ঐ বজরাটায় যাবি ?" অস্ত বলল।

—"চল।"

দুজনে জামা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। অস্ত খুব ভাল সাঁতার জানে, অমলও একেবারে খারাপ নয়। শান্ত জল ভেঙে ঝুপ্ ঝুপ করে ওরা এগুতে লাগল, ভারী সুন্দর দেখাল জলের মধ্যে ওদের কচি শরীর। নীল আকাশ সকৌতুকে ওদের দেখতে লাগলেন।

বজরা নৌকোতে ওঠে দুজনে চুপি চুপি গায়ের জল নিঙরে নিল। একটু ভয়-ভয় করতে লাগল ওদের। কি করবে, কাকে ডাকবে এখন !

এই সময় হঠাৎ একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন দীর্ঘ সৌম্য প্রায়-বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন, "এসো, এসো, ভিতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠল অস্ত আর অমল। অস্ত ফিস্‌ফিস করে বলল, "রাজাবাবু, এ সেই রাজাবাবু ! চলে আয়।" তারপর ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। প্রাণপণে সাঁতরে পারে উঠে ছুটে অদৃশ্য

হয়ে গেল। অমল কি করবে ভেবে পেল না। অতবড় একজন লোকের সামনে হাত পা ছুঁড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর লজ্জা করল। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই সৌম্য বৃদ্ধ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলেন অন্তুকে। তারপর অমলের দিকে ফিরে বললেন, "এসো, ভিতরে এসো।" হাত ধরে অমলকে নিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে।

বৃদ্ধের মুখে সাদা দাড়ি, পা পর্যন্ত ঝোলানো একটা আলখাল্লা পরা। ঘরটা সুন্দর সাজানো। জানলার পাশে একটা ছোট টেবিল। সেখানে পিতলের প্রদীপদান, দোয়াত কলম, একটা কাগজে কয়েক লাইন কি যেন লেখা। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, ঘরের কোণে একটা বেতের চেয়ারের মাথায় সেই সাদা পাখিটা।

—"ঐ তো সেই পাখিটা!" হঠাৎ অমল বলে উঠল।

—"তুমি বুঝি ওটাকে ধরতে চেয়েছিলে?" প্রসন্ন হেসে বৃদ্ধ বললেন।

—"হ্যাঁ।"

—"কিন্তু ওকে তো ধরা যায় না। ও এমনিই উড়ে উড়ে বেড়ায়।"

—"কিন্তু আমি যে ওর জন্যে একটা খাঁচা বানালুম।"

—"তা বেশ করেছ। সে খাঁচায় পাখি রাখবার দরকার নেই। খাঁচার মধ্যে পাখিটাকে মনে মনে কল্পনা করে নিও। সেই কল্পনার পাখি দেখবে কেমন সুন্দর গান করবে, ডাকবে। আসল পাখিগুলো উড়ে বেড়াক আকাশের বিশাল নীল মাঠে, কেমন?"

অমল মাথা নাড়ল। সব কথা সে ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু তার ভাল লাগল।

—"তোমার নাম কি?"

—"অমল।"

"—বাঃ, ভারি সুন্দর নাম।"

—"আপনি কে, আপনি কি রাজাবাবু ? আপনার জন্যই কি আজ আমাদের ইস্কুল ছুটি ?"

—"না, আমি রাজাবাবু নই, আমি তোমাদেরই লোক।"

—"আপনার নাম কি ?"

—"আমার নাম তোমার মত অত সুন্দর নয়। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বিস্ময়ে অমলের চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম। "আপনিই তো সেই ! আপনার জন্যই তো বাবা দু দিন ধরে জমিদার বাবু আসবেন, জমিদারবাবু আসবেন, বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।"

—"না, অমল, আমি রাজাবাবু নই, আমি তোমাদেরই লোক। আমি তোমার বন্ধু।"

—"আপনি 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' লিখেছেন ? আর সেই 'ভূতের মতন চেহারা যেমন'। সেই 'পঞ্চনদীর তীরে', 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত'—সব আপনার লেখা ?"

—"হ্যাঁ। তোমার ভাল লাগে !"

—"আমি সব পড়েছি। আমার কাছে যা আছে। কিন্তু আর নেই আর পড়তে পাই না। আর লেখেন নি ?"

—"অনেক লিখেছি, অনেক, সে সব বড় হয়ে পড়বে। আচ্ছা তোমার জন্যে আর একটা নতুন লিখব।"

এমন সময় বাইরে একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল। কর্তাবাবা আছেন নাকি !"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বসো অমল, দেখে আসি কে এসেছে।" তিনি বাইরে এলেন।

বাইরে একজন লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নায়েবের

ভাই লোচনদাস ঘোষ। সে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল।

—"কি খবর লোচন?"

—"আজ্ঞে, আমার ছেলেটা নাকি এখানে এসেছে. বড় দুরন্ত ছেলে, হয় তো আপনাকে বিরক্ত করছে।"

—"অমল তোমার ছেলে? ভারী সুশ্রী ছেলেটি।"

বাবার গলা শুনে অমল বেরিয়ে এল বাইরে। এখন আর তার ভয় নেই। এই সময় সাদা পাখিটি ঝটপট করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে কোন দিকে উড়ে গেল। অমল সেইদিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল।

—"যাও অমল, বাবার সঙ্গে যাও, আবার এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

—'কিন্তু আমার সেই নতুন বই?'

—'সেই বই লেখা হলে তোমাকে চিঠি লিখবো।'

অমল চলে গেল। তারপর থেকে তার দিন কাটতে লাগল অন্যরকম ভাবে। যার নামে গ্রামের সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে যায়—তিনি অমলের বন্ধু। তিনি অমলকে চিঠি লিখবেন, বলেছেন। অন্তু যখন খেলায় ফার্স্ট হয়, তখন অন্তুকে অমলের একটুও হিংসে হয় না। অন্তুর তো তার মত কোন বন্ধু নেই, অন্তুর জন্য তো কেউ বই লিখবে বলেনি।

তারপর নানান দেশ বিদেশ ঘুরে অনেক লোকজন দেখে দু বছর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার এলেন শিলাইদহের সেই ছোট্ট গ্রামে। গ্রামের লোকজন সকলে এসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গেল। অমলের কথা তাঁর মনেই পড়লো না। হঠাৎ একদিন সকালবেলা তাঁর সেই বজরা নৌকোর গলুই-এ সেই সাদা পাখিটিকে দেখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো সেই ছেলেটির কথা, যে একটা খাঁচা বানিয়েছিল পাখিটার জন্য। ব্যস্ত হয়ে তিনি নায়েবকে ডেকে তার ভাইয়ের ছেলের খোঁজ করলেন। শুনলেন যে অমলের খুব অসুখ। ছ মাস ধরে ভুগছে। বাঁচে কি মরে ঠিক নেই। বিচলিত হয়ে তিনি বললেন, 'আমি অমলকে দেখতে যাব।'

গ্রামের পথ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হেঁটে চলেছেন। সঙ্গে বেশী লোকজন আনেন নি। একজায়গায় দেখলেন, একটি সুন্দর ছোট্ট মেয়ে শেফালী ফুল তুলছে। মেয়েটা লাল পাড়ের শাড়ি পড়েছে, ফর্সা রং—তাকেও একটা শেফালী ফুলের মতই দেখাচ্ছে।

—'তোমার নাম কি ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

—"আমার নাম সুধা।" মেয়েটি বললো।

—'তুমি অমলকে চেন ?'

—'হ্যাঁ—।' মেয়েটি সুর করে উত্তর দিল, তারপর একটু থেমে নিচের দিকে চেয়ে বলল, 'তার যে খুব অসুখ।'

রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আবার চললেন। বাড়ির উত্তরের ঘরে অমল শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে ডাক্তার-কবিরাজ-আত্মীয়, অমলের বৃদ্ধ ঠাকুর্দা। কি শীর্ণ চেহারা হয়েছে অমলের, চেনাই যায় না প্রায়। তাঁকে দেখেই অমলের চোখ ছল ছল করে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বলল, 'আপনি এসেছেন ?'

—'হ্যাঁ। অমল, আমি এসেছি। তোমার কোন ভয় নেই।' তারপর রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর মত কথার যাদুকরও কথা হারিয়ে ফেললেন। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আমি খবর এনেছি—তোমার সঙ্গে রাজার দেখা হবে।'

—'রাজা ?'

—'হ্যাঁ, অমল। আমি তোমার বন্ধু, তোমার সঙ্গে এক মহান রাজার দেখা হবে—যাঁকে আমরা পর্যন্ত দেখতে পাই নি।'

—'আমার চিঠি? আমাকে চিঠি লিখলেন না?'

—'ঐ দেখ, স্বয়ং রাজা তোমাকে চিঠি লিখেছেন।' রবীন্দ্রনাথ আঙুল তুলে জানলার দিকে দেখালেন। অমল তাকিয়ে দেখল, সকলে দেখল, জানলা দিয়ে বর্শার মত রোদ্দুরের শিখা পড়েছে—আর সেই জানলার শিকে সেই সাদা পাখিটা বসে আছে। কি আশ্চর্য পাখি, ঠিক এসে অমলের জানলায় বসেছে। ঘরের কোনে অমলের তৈরী খাঁচাটা এখনও আছে।

অমল একদৃষ্টে সেই পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে, খুব ঘুম পাচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর হনহন করে বজরার দিকে ফিরে চললেন। যেন তিনি বিষম ব্যস্ত। তাঁর আর সময় নেই। তাঁকে এখুনি গিয়ে অমলের জন্য একটা বই লিখতে হবে।

বীরপুরুষ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

বীরপুরুষের কথা যতবার ভেবেছি ততবার আমি অবাক না হয়ে পারি নি। ঠিক যেন আমার কথাগুলোকেই ছন্দ দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন রবিকবি। তখন আমি ছোট্ট ছিলাম, কাগজের এরোপ্লেন বানিয়ে মেঘের আড়ালে চলে গিয়ে আজব দেশ দেখে বেড়াতাম। বেড়ান শেষ হলে মনে বড় আক্ষেপ হ'ত, আহা সত্যি সত্যি কেন যে কাগজের এই পল্‌কা ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যাওয়া যায় না। কি মজাই না হত! আক্ষেপে গা নিশপিশ করত আমার।

একদিন আমি বলেছিলাম, আমায় একটা এরোপ্লেন কিনে দেবে? সত্যিকার এরোপ্লেন?

বড়রা তো হেসেই কুটোপাটি। বড়রা বড় হিংসুটে। ছোটদের কথা শুনতেই চায় না। শুনবে কি, ওরা তো আর সত্যি সত্যি বড় নয়, সত্যি সত্যি বড় ছিলেন রবি কবি। নইলে অতবড় হয়েও কি করে উনি ছোটদের কথা ভোলেন নি! আমার ছোটবেলাকার ভাবজগতের সব অভাব-অভিযোগ-আমোদের কথা কি করে উনি লিখে রাখলেন। রবি কবিকে আমি দেখি নি। শুনেছি, খুব নাকি আমুদে লোক ছিলেন। ছবিতে ওঁকে দেখে জ্যান্ত একটা মানুষ আমি মনে মনে গড়ে নিতাম। কবিতার বই খুলে বসলেই লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলত। আমি ভারী মজা পেতাম। কখনো ব্যথায় বুক ভরে থাকত। কখনো খুশিতে তির তির করে কাঁপত অনুভূতিগুলো। রবি কবিকে সতি সত্যি ভালোবেসেছিলাম, নইলে, অমন হত কেন?

একদিন বিকেলবেলা জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। খানিকক্ষণ আগে বুধো এসে পরোয়ানা জানিয়ে গেছে আজ আমার ঘরের বাইরে যাওয়া নিষেধ। আমার জন্মের আগে থেকেই বুধো এ বাড়িতে চাকরি করে। তার পরোয়ানাকে ঠেলে ফেলার সাহস আমার ছিল না। তাই জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দূর দূর দেশে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর গতি ছিল না সেদিন। সামনেই পল্টুদের বাড়ির পেছন দিয়ে তাল গাছটা আমার নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচে ওকে বললাম,

তাল গাছ এক পায় দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।

ঠিক যেন আমার মতই বন্দী হয়ে আছে গাছটা। মাটির ভেতর শেকড় ডুবিয়ে ভাবছে, আকাশে উড়বে।

সারাদিন ঝর্‌ঝর্‌ থথর
কাঁপে পাতাপত্তর
ওড়ে যেন ভাবে ও—
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
কোথা যেন যাবে ও॥

কিন্তু যেতে চাইলেই কি যাওয়া হয়। তালগাছটার জন্য ভারী মায়া হয়েছিল আমার। এমন সময় দূরে, স্টেশনের লাইনের ধারে একটা রেলগাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম। আর তাইতে তালগাছটার কথা ভুলে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল মস্ত একটা মাঠ।

তখন, সেই মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে আমি

এক ডাকাবুকো দস্যুদলের মুখোমুখিই পড়ে গেলাম। ঢাল তলোয়ারে সাজা আমি এক বীরপুরুষ হয়ে গেছি দেখতে দেখতে। উঃ, কী ভীষণ লড়াই না হ'ল! 'কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।' মাতো ওদিকে পাল্‌কীতে বসে ভয়ে ভয়ে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছেন, মায়ের ধারণা আমি এখনো খোকাই আছি। আমার গায়ে কি অত ভীষণ জোর আছে! জোর আছে কি নেই তা আমি রক্তে নেয়ে ঘেমে সব্বাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিলাম।

কিন্তু, এরপরই সারা মন আমার ঝিমিয়ে পড়ল। কেন যে অসম্ভব একটা কিছু করে ফেলতে পারছি না। আমি কেমন মিইয়ে পড়লাম।

'রোজ কত কি যে ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।'

জানলার গরাদগুলো শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম, আমি বুঝতে পারছি চোখদুটো আপনা থেকেই ছলছল করে উঠছে আমার। বিশ্বাস করো, সেদিন আমার সত্যি সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল।

তাই বারবার আমার মনে পড়ে বীরপুরুষ কবিতাটা যেন আমাকে নিয়েই লেখা। আমার জন্য লেখা। আমি অবাক না হয়ে পারি না।

তারপর এক যুগ পেরিয়ে গেছে। ছেলেবেলাকার সেই রং মাখা দিনগুলো পেছনের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে। তাইতে আবার নতুন করে আক্ষেপ হয়। এরোপ্লেন কেনার কথা মনে পড়লেই হাসি পায়, আক্ষেপ হয়। বয়সের দিক থেকে কেবল বড় হয়েছি। কিন্তু আর দশজন যেমন হয়, হায়রে, তেমনি ঘরকুনোই রয়ে

গেলাম বোধ হয়। না পেলাম ঘরের স্বাদ না বাইরের। না পেলাম বাস্তবের না কল্পনার।

আজ যখন আমাকে কিছু বলতে বললে তুমি, আমি ওঁকে বীরপুরুষ না বলে পারছি না। রবিকবি বীরপুরুষের মতই বেঁচে-ছিলেন, বেঁচেও আছেন। মিথ্যে নয়, সত্যিই তিনি লড়েছিলেন। সত্যি সত্যি তিনি মাটিতে শেকড় রেখে আকাশেও উড়েছিলেন।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

মাগো,

আজকে ভোরে ঘুম ভেঙ্গে মনটা আমার নেচে উঠলো। এত ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছে, অন্যদিনের মত কুয়াশাজড়ানো অন্ধকার নেই তো কোথাও। আকাশ ঘননীল। বাতাস আনন্দে উথাল পাথাল। কাঠচাঁপা গাছটায় দুটো শালিক খুশিতে ভরপুর। আমি পা টিপে টিপে বাগানে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমারো অনেক আগে ওদের ঘুম ভেঙ্গেছে। সারা বাগানখানা কে যেন সাজিয়ে দিয়েছে রঙে রঙে, ফলেফুলে, পাতায় পাতায়। অতসী, অপরাজিতার কাছ ঘেসে দুপুরমণি গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালাম। কে যেন ফিসফিস করে আমায় বললো, আজকের আনন্দের উৎসবে তুমি আসছো তো ?

আনন্দের উৎসব ? আমি তাকালাম।

হাঁ, আজ যে পঁচিশে বৈশাখ, সেই স্বর আবার ধ্বনিত হলো। দূর থেকে দেখলাম, লতানো ফুলের একটা দল আমায় হাতছানি দিচ্ছে। অন্যদিন ওদের ক্লান্তচোখ এতভোরে পৃথিবীর ছবি দেখেনা। কিন্তু আজ ? আজ দেখছি ভারী খুশি ওরা। দুলে দুলে, বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে উৎসবের সুর তুলেছে যেন। আমার মন খুশিতে ভরপুর। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চাঁপা, টগর, বেল, চামেলি, কেয়া, হাস্নুহানা সবাই হাতে হাত দিয়ে নাচতে সুরু করেছে। মনে হলো ওরা বলছে, এসো আনন্দের প্লাবনে পরিপূর্ণ হই। আজকের আকাশ বাতাস ভরে উঠুক কবির গানে গানে।

আমি বললাম, কেন আজ তোমাদের এই উৎসব? চোখের তারায় নাচন এনে ওরা বললে, জানোনা, আজ পঁচিশে বৈশাখ। পঁচিশে বৈশাখ, আমি শুনতে পেলাম বাতাসে ভেসে আসছে সুর :

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ॥

ছোট্ট পুপে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ফিসফিস করে বললো, জানো দাদা, আজ কবির জন্মদিন ; পঁচিশে বৈশাখ। ধীরে ধীরে প্রথম সূর্যের রক্তিম আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়লো পুপের মুখখানায়। আনন্দে নেচে উঠলো মন। পুপের গলায় শুনতে পেলাম 'বিজ্জের' মত সুর,

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,—
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।
আমি যখন খাওয়া খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,

ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে,
মুঠো করে মুখে দেয় মা পুরি।
সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি "খুকি পড়া করো"
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে,—
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।

এমনরূপে আগে ত' ওকে কখনও দেখিনি। বাগানের আলো আঁধারীতে গাছের আড়াল থেকে কখনো বা লতানোফুলের ঝোপের অন্ধকার ভেদ করে পুপের গলা ভেসে এলো,

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপাব গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মাগো, ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
তবে তুমি আমার কাছে হার',
তখন কি মা, চিনতে আমায় পার'।

... ...

দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে ;
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে ;
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি ;
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে,
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে॥

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বলো" তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, "দুষ্টু, ছিলি কোথা।"
আমি বলব, "বলব না সে কথা।"

তোকে এ আনন্দের সন্ধান কে দিয়েছে পুপে? অবাক শোনাল আমার গলা।

দৃপ্ত উত্তর পেলাম, রবীন্দ্রনাথ।

মাগো, আমি আবার নতুন চোখে দেখলাম পৃথিবীকে। ছোট বড়, গাছপালা, অরণ্য, প্রকৃতিতে মিশে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোট্ট পুপে আমাকে আলোকের সন্ধান দিল। দিল অমৃতের স্বাদ।

রাতের আকাশে তারায় তারায় মাগো তুমি কি দেখতে পাও রবীন্দ্রনাথকে? তিনি কি আজও তোমায় বলেন,

জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগণতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা॥

প্রণাম নাও

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরনী ডুবে সুদূর জলে
মরণদূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা॥
প্রণাম নিও। ইতি তোমার

শিশু ভোলানাথ

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

দিব্যেন্দু পালিত

বাল্যবয়সে প্রথম যেদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি প'ড়েছিলুম, আমার মন ভ'রে গিয়েছিলো অনির্বচনীয় আনন্দে; হৃদয় থেকে উৎসারিত এক উচ্ছল উদ্দাম প্রবাহের ছবি যেন দেখেছিলুম চোখে। তখন কবিতা ভালো বুঝি না, স্বীকার করছি; কিন্তু নির্ঝরের বাধা-বন্ধন-হারা আবেগ বুঝবার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কি? মন বললো: আশ্চর্য! নমস্কার জানালুম সেই কবিকে, যিনি সুন্দর; যাঁর শব্দের ব্রতে, ছন্দের স্রোতে নীরবতা বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে, জড় পায় জীবন; শিলায় শিলায় বেজে ওঠে ঘুম-ভাঙার উন্মুখর প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ আমার শৈশবের স্মৃতি।

কিন্তু সে-স্মৃতি, সুন্দরের ছবি বেশিদিন বাঁচিয়ে-রাখা গেল না; রবীন্দ্রনাথের সুন্দর সম্পর্কে মনে যে-মোহ গ'ড়ে উঠেছিলো, তা ভেঙে গেল অচিরে। হেমন্তের এক সন্ধ্যায়, বয়স তখন কিছু বেড়েছে, এক ছবি দেখে চমকে উঠলুম। সে-ছবি কবির নিজের হাতে আঁকা; রূঢ়, রুক্ষ ও কঠিন, অনায়াসে 'নিষ্ঠুর' বলা চলে; আর কারুর নয়, কবির নিজের ছবি, নিজের মুখ, যেন শিলায় খোদিত এক অসমাপ্ত ভাস্কর্য। রঙের ব্যবহার বেশ চড়া, কোথাও কোথাও অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল। যেন অতৃপ্ত বাসনার এক শিল্পী নিজেকে আঁকতে গিয়ে আত্মরূপ শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেননি, স্বাভাবিক অধৈর্যে চোখের দৃষ্টিতে ক্ষমার পরিবর্তে ভ'রে দিয়েছেন

দুরন্ত আক্রোশ। সে-ছবি ভোলবার নয়। তার তলায় দুটি পংক্তি ছাপা ছিলো :

'আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,...।'

কিন্তু বার বার সাদৃশ্য খুঁজলেও নির্ঝরের অশান্ত আবেগের সঙ্গে সে-ছবি কোথাও মেলে না ; বরং সে পাষাণ-কারা ভাঙতে পারে ; কিন্তু করুণার চিহ্নমাত্র নেই। কবিতা যদি সুন্দরের হয়, তাহলে, আমার মনে হয়েছিলো, কবির প্রতিকৃতিতে সৃষ্টির সঙ্কল্পের চেয়ে ধ্বংসের উন্মাদনা অনেক বেশি ; সে-ছবি প্রবল ও প্রখর, ক্ষমাহীন অসুন্দরের। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও গদ্য যতো পড়েছি, এবং যতোবার দেখেছি তাঁর ছবি, ততবারই এ-ধারণা মনে গাঢ় হয়েছে যে, কবিতায় ও গদ্যে তিনি 'সুন্দর', কিংবা বলা যায় 'সৌন্দর্যের কবি' ; কিন্তু শিল্পচর্চায় 'অসুন্দর' প্রশ্রয় পেয়েছে তাঁর মনে ; রবীন্দ্রনাথ 'অসুন্দরের শিল্পী'।

একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মতো যে : কবি রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, অর্থাৎ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে-বিপুল পরিবেশে ব্যবহৃত, যতখানি আলোচিত, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সে-তুলনায় পেয়েছেন শুধু নৈঃশব্দের অভিবাদন ; সেখানে শ্রদ্ধার চেয়ে স্বীকৃতি অনেক কম। তার কারণ বোধহয় সাহিত্যিক ও শিল্পীর মধ্যবর্তী সত্তার দূরত্ব, যা কোনোমতেই অতিক্রম্য নয়, সেতু-বন্ধনের সামান্য সম্ভাবনাও লুপ্ত। অন্তত যে-দেশের মানুষের মনে, যে-দেশের মাটি ও ঋতুতে তাঁর আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি ও স্বপ্ন প্রতি মুহূর্তে আন্দোলিত হয়েছে, যে-দেশে জন্মের পরই রবীন্দ্রনাথকে 'সুন্দরের পূজারী' ইত্যাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশেষণে চিনে নিতে হয়, সেখানে তাঁর অসুন্দরের ঘোষণা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়,

কল্পনাতীত ; প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে সেজন্য দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, অবহেলায় না হ'লেও, শ্রদ্ধায়। যে-রাজ্যে তিনি নির্বাসিত, সেখানে অবিমিশ্র সুন্দর ক্বচিৎ কৃপণের মতো হাসে, ঋতুর রঙ বিবিধ বর্ণে সর্ণালী হ'য়ে ওঠে না ; বরং, বলা চলে : মাটির ভিতর থেকে চাপা বিক্ষোভ শোনা যায়; রঙ সেখানে রক্তের মতো ব্যাপ্ত, প্রগাঢ় ও উজ্জ্বল। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একা এবং নিঃসঙ্গ।

০০ দুই ০০

রবীন্দ্রনাথ কেমন ছবি আঁকতেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় : একজন উচ্চ মানের শিল্পী তিনি, কিন্তু তাঁর বিষয়ে সংক্ষেপে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ কথা নয়। অসুন্দরের শিল্পী ; কিন্তু, কি কারণে 'অসুন্দর' তা বুঝবার জন্য তাঁর ছবির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় প্রয়োজন। গল্প ও কবিতা এবং অন্যান্য রচনা দিয়ে যেমন, তেমনি ছবি দিয়েও তিনি নিজের চতুষ্পার্শে এক বৃহৎ বেষ্টনী গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি মনোরম, চোখে রীতিমতো আঘাত করে ; সে-সব ছবির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে না-এলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করা এক রকম অসম্ভব।

তবে একটি কথা দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার মূল সূত্রটির কাছাকাছি আসা যেতে পারে। 'ছন্দ'। বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন, সমস্ত কর্ম ও শিল্পাদর্শের গোড়ার কথা এই ছন্দ। যে-ছন্দ তাঁর সাহিত্যে ও সঙ্গীতে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিলো, চিত্র-কর্মেও তার অনায়াস বিচরণ, অনবদ্য উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বাল্য বয়স থেকেই ; কিন্তু সে-উৎসাহ

নেশায়, কিংবা বলা চলে, অবশ্যকর্তব্যে পরিণত হ'লো শেষ বয়সে —কবি রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির অধিকারী, বয়স হরণ করেছে অনেক, যখন প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য কি গান অথবা সৃষ্টির অন্যান্য স্তরে যে ছন্দোময়তার প্রবর্তন ক'রেও তাঁর মানসিক অপূর্ণতা দূর হয় নি, রঙে, রেখায় সৌন্দর্যের নতুন রূপান্তরের মধ্যে তিনি তার সম্পূর্ণতা আবিষ্কার করেছিলেন।

অন্যান্য বড়ো শিল্পীদের ক্ষেত্রে আমরা যেমন চর্চার ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ করি; উত্তরণের প্রত্যেকটি স্তর, পরিবর্তনের বিশেষ বিশেষ সময় এবং অবলম্বনগুলি যেমন স্পষ্টগোচর হয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের তেমন কোনো সুযোগ দেন নি। প্রতিভার মধ্যবয়স পর্যন্ত তিনি নিজেই কি জানতেন, ছবি তাঁকে একদিন আঁকতেই হবে, এবং তাঁর বহুমুখীতার অনন্য দান হিসাবে গণ্য হবে তাঁর চিত্রকলা? মনে তো হয় না। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো স্থির ধারণার প্রশ্রয় দেওয়াও সম্ভবত অযৌক্তিক হবে। রবীন্দ্র-মানসে শৈশব থেকেই কোথাও যেন এক নিঃশব্দ অথচ বর্ণবহুল পৃথিবী প্রচ্ছন্ন ছিলো। এক দিকে যেমন তিনি কবিতার মিল খুঁজেছেন, তেমনি অন্যদিকে মনে-মনে এঁকেছেন ছবির পর ছবি, রূপের যতোটা আভাস দেখা দিয়েছে, তারও বেশি হারিয়ে গেছে রূপাতীতে, এবং সেই হারানো, একদা লক্ষ্যভ্রষ্ট স্মৃতিকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ বয়স পর্যন্ত। তিনি নিজেই লিখেছেন: দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই তাহার প্রধান অংশ।

ছবি আঁকার বাসনা প্রথম কবে তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিলো, তা বলা কঠিন। তাঁর ছবির সংখ্যা দু'হাজার কিংবা আরো কিছু বেশি, ছবিগুলি মোটামুটিভাবে ১৯২৯ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যবর্তী সময়ের সৃষ্টি। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গল্পগুচ্ছ, গোরা, চতুরঙ্গ বা এদের সমকালীন রচনার বিষয়বস্তুই পরবর্তীকালে আরো বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো। যদিও তাঁর রূঢ়তা, পৌরুষ, দৃপ্ত কাঠিন্য কি বলিষ্ঠ প্রত্যয়, কিংবা যাকে 'অসুন্দর' বলেছি, কোনদিনই তাঁর সাহিত্য-বিষয়ে প্রবেশ করেনি—তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতার পেলব, কোমল সুকুমার চরিত্র শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেছে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এইখানে।

য়ুরোপের অনুসরণে চিত্রাঙ্কনে দীক্ষা নিয়েছেন, পরে ফিরে এসেছেন স্বদেশের ধ্যান-ধারণায়, এমন শিল্পীর সংখ্যা আমাদের দেশে অগৌণ নয়; বরং বেশি। এর ফল কোথাও কোথাও, কোনো কোনো শিল্পীর পক্ষে ভালো হয়েছে নিশ্চয়; কিন্তু সেখানে তাঁদের শিক্ষারীতির চেয়ে নিজস্বতার গুণই ব্যাপকভাবে কার্যকরী বলতে হবে; তা না হ'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ফল অশুভ প্রতিপন্ন হ'তো না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এদের পথ বর্জন করেছেন। সাহিত্যের মতো, তাঁর চিত্রজগতে পর্যটনও প্রাচী থেকে ক্রমশ প্রতীচীর দিকে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। সাহিত্যে বিশ শতকের পথে তিনি যতো এগিয়েছেন, ততই য়ুরোপীয় মনন ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু, সর্বোপরি পাশ্চাত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় যেমন তাঁর সাহিত্যধর্মের মূল প্রাচ্যভাবে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, তেমনি আধুনিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেও য়ুরোপ তাঁর চিত্র-চরিত্রে কোনো স্থির প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আরো

একটু বিশদ করতে হ'লে তাঁর চীনে ধরনের 'ক্যালিগ্রাফি' ছবিগুলির দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে—অত্যন্ত ঋজু, স্পষ্ট রেখায়, রঙের প্রশান্ত ব্যবহারে, সামগ্রিক সঙ্গতি ও সাদৃশ্য রক্ষায় সেগুলি অনন্য। এর অন্যতম কারণ বোধহয় চিত্রজগতে তাঁর আবির্ভাবের আকস্মিকতা ; এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশীর অভাব।

আগেই বলেছি, চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো 'অ্যাকাডেমিক' পাঠ গ্রহণ করেননি, সুযোগ বা প্রয়োজন হয়নি বলেই হয়তো ; এবং সেজন্য ক্রমিক উন্নতির সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁর বিবর্তনের ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর লিপিকুশলতার গভীর যোগ রয়েছে। চিত্রের প্রথম রূপ চোখে পড়ে তাঁর সুন্দর হাতের লেখার অসুন্দর ও অমসৃণ কাটাকুটিতে। প্রথমদিকে অবশ্য সেগুলি প্রায়ই অনুল্লেখ্য, সৃষ্টির দ্রুত অমনোনয়নের চিহ্নমাত্র। তারপরে এলো জন্তু, লতাপাতা ইত্যাদির কষ্টকল্পনা, আভাসে মাত্র ধরা যায় এমন ; চোখ কি মুখের ঈষৎ ভাব, আজগুবি ধরনের পা, শরীর, মাথা, একটি অসম্পূর্ণ ফুল, বৈচিত্র্যবিহীন লতাপাতা ইত্যাদি। কবির চৌষট্টি বছর বয়সে এলো 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি, যাকে তাঁর চিত্রকর্মের তৃতীয় পর্যায় বলতে পারি। শেষের দিকে হস্তলিপি কেটেকুটে আগের চেয়ে পরিণত ছবি—যদিও প্রায়ই আজগুবি আকারের, একাধিক জন্তুকে একই অবয়বে ধরে রাখার অর্থহীন প্রয়াস, চোখে পড়ে। বাস্তবের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য অত্যন্ত অল্প, নেই বললেই চলে ; সুতরাং সে-সব ছবিতে ঘনতা বা গভীরতা নেই, চিত্রের পরিভাষায় : দুই মাত্রিক। সাদৃশ্য নেই, কোনোরকম চিন্তাও রয়েছে বলে মনে হয় না ; অথচ ছন্দ ও গতি

রয়েছে, রয়েছে বেগ এবং আবেগ—যা রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রধান উৎকর্ষ প্রথম দিকে ছিলো শুধুই ছন্দ, পরে তা শরীর পেলো; তার গমন ভাব থেকে রূপে। গতি বা ছন্দ এখানে রূপের আধারে স্থির। উদাহরণত, পূরবী'র 'শেষ বসন্ত' কবিতার পাণ্ডুলিপির অংশ-বিশেষ উপস্থিত করা যায়ঃ

'বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে॥

... ...

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী॥'

পূরবী'র পৃষ্ঠায় এই পংক্তিগুলি লেখা হয়েছে যে-ছবির বুকে, তা দেখে কোনো গহন গভীর বাস্তবের অরণ্যকে নাই বা মনে পড়লো; কিন্তু গভীর কালোর মাঝে মাঝে যে আলোর কণিকা ইতস্তত ছড়ানো, যা প্রায় আকস্মিক বিদ্যুচ্চমকের দীপ্তিকে ধ'রে রাখার মতো, তাকে অরণ্যের অনুরূপ কোনো পরিবেশ বলে মনে হয় না কি? রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক পাণ্ডুলিপির দর্শন মিলবে, চিত্র যেখানে বিচিত্র—এমন সব জীব-জন্তু, প্রকৃতি, বাড়ি-ঘর, ত্রিভুবনে যা কেউ কোনোদিন নির্মাণ করেছেন বা দেখেছেন বলে মনে হবে না। তবু সেগুলির রূপ-কল্পনায় যে-ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে, কোনো ছবিতে প্রাণ-সঞ্চার করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আপাত দৃষ্টিতে বাস্তবের সঙ্গে তাদের বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয় ব'লেই রবীন্দ্রনাথের ছবি অতিমাত্রায় বাস্তব; আসলে শিল্পীর মনে বাস্তবের যে-বাসনা ও রূপ জন্ম নেয়, রবীন্দ্রনাথের চিত্রে তাই প্রশ্রয় পেয়েছে। কালোর মাঝে তিনি আলোর সমাবেশ ঘটিয়েছেন, আলো যেন কালোর সঙ্গে সংঘর্ষে শব্দে বেজে উঠছে, চেতনা মুক্তি

পাচ্ছে সুপ্তির গভীর থেকে। রঙ ও রূপের কোনো ভাষা নেই, প্রাণ ও আবেগের মধ্যেই তার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট।

চতুর্থ পর্যায়ে আর পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি নয়, রঙে ও কাগজে তিনি সরাসরি ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বিষয় স্থির কিছু নয়, আগের মতোই বস্তু-বিচ্ছিন্ন বা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট', কিছুটা কাল্পনিক। আর, যখন তাঁর শিল্পীজীবনের পঞ্চম পর্যায়, তখন তিনি রীতিমতো সে-কাজের পিছনে সময় ব্যয় করছেন, আঁকছেন একসঙ্গে অজস্র ও অসংখ্য-বন্যার স্রোতোধারার মতো অবিরাম ; প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু কি ল্যাণ্ডস্কেপ্ থেকে পোট্রেট্, গ্রুপ, সবকিছু।

শিল্পী ছিলেন উঁচুদরের ; কিন্তু শিল্পীজনোচিত ধৈর্য রবীন্দ্রনাথের ছিলো না। কারণ, তাঁর মানসিক রূপান্তর ঘটেছে প্রতিমুহূর্তেই। তেলরঙ শুকোতে দেরি হয় বলে তেলরঙের ছবি তিনি দু'তিনটির বেশি আঁকেন নি ; এমনকি যে-কোনো ফিগারের প্রথম ড্রইংকেই শেষ ব'লে মেনে নিয়েছেন, আউটলাইনের সামান্য পরিবর্তন করায় পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছিলো না। আঁকতেন পেলিক্যান কালিতে, স্পিরিট মিশিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছবিকে ঘন ও গভীর করতে চেয়েছিলেন ; এবং তা করেছিলেন প্রকটভাবে। উপরন্তু, রঙের ঐশ্বর্য বজায় রাখবার জন্য নানা রঙ মিশিয়ে এক নতুন, অত্যন্ত বলিষ্ঠ উপাদান ব্যবহার করেছেন, যার ফলে তাঁর যে-কোনো পরিণত ছবির রঙের জৌলুস, জীবন্ত দ্যোতনা দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। রঙকে তার নিজস্ব রূপ ও প্রাণ দেবার জন্য কাগজের উপর তিনি রঙের পর রঙ দিয়েছেন ব্যগ্র হাতে ; সাদা রঙের পরিবর্তে জমিতে ফাঁক রেখে দিয়েছেন, যাতে দু' তিন প্রস্থ চড়া রঙের মধ্য থেকে তা অনিবার্য ভাবে চোখ টানে। ভারতীয় চিত্রে রঙের ব্যবহার ছিলো এতোদিন শুধু ভাবের

মুখ

শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশে, রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'অসুন্দর' বিষয় চেতনায় এনে তার শৈল্পিক সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, এমন কি বিভীষিকাময় পরিবেশের প্রবর্তনেও দ্বিধান্বিত হন নি। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব।

এ-দ্বন্দ্ব এবং অসুন্দরের ব্যঞ্জনা আরো স্পষ্ট হবে রবীন্দ্রনাথের 'আদিম সৃষ্টির আদর্শে' ছবিখানি দেখলে। আমি দেখেছিলুম, একবারই ; এখনো ভুলতে পারিনি। সে-অসুন্দর অবিস্মরণীয় !

গন্ধের কৌটো

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ যখন সত্যিকার ছোটোদের বই লিখলেন, যেখানে বড়োরা কিছুতেই হাত বাড়াতে পারবেন না, কেবল ঈর্ষা করবেন, তৃষিত হবেন, এবং নিজেদের বড়ো হওয়াকে নিয়ে আপশোশ করবেন —অর্থাৎ 'সহজ পাঠ' যখন বেরোলো,—তার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ', 'মুকুট আর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'রাজর্ষি' আর 'বিসর্জন', এবং তার পরে তো আরো নাম যোগ করা যায়, যেমন 'ব্যঙ্গকৌতুক' 'হাস্যকৌতুক' ; এদিকে 'অচলায়তন' 'শারদোৎসব' 'কথা ও কাহিনী', এমনকি 'ডাকঘর' আর 'লিপিকা', উপরন্তু 'গল্পগুচ্ছ'র প্রথম দুই খণ্ড তো আছেই ; 'সহজ পাঠে'র পরেও তো আরো অনেক লিখেছেন, 'সে', 'খাপছাড়া' 'ছড়া' 'ছড়ার বই', 'গল্পসল্প', 'ছেলেবেলা' ;—মৃত্যুর অনেক পরে বেরোলো 'চিত্র-বিচিত্র' ; এবং তা ছাড়াও অনেক লেখা ছড়িয়ে থাকলো সাময়িকীর পাতায়, যা হয়তো ভবিষ্যতে কোনোকালে সংকলিত হবে। কিন্তু কেবলমাত্র 'সহজ পাঠ'ই বোধ করি তাঁর কাছ থেকে একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে এবং নিজের ক'রে পেলো, যেখানে বড়োদের কোনোই অধিকার নেই। বড়োরা কেবল ঈর্ষা করতে পারেন ছোটোদের ভাগ্যকে, কেননা যে-বয়সে কেবলমাত্র ক-খ চিনলেই যথেষ্ট, সেই বয়সেই এই বইটির এক ও দুই নম্বর সাহিত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়, চিনিয়ে দেয় শব্দ, ছন্দ, বর্ণ, গন্ধ, ও রস, গ'ড়ে তোলে এক বিস্মিত পৃথিবী, যেখানে ফুল প্রজাপতি হ'য়ে উড়ে যায়, প্রদীপের আলো হয় ছোট্ট জোনাকি, আর খালি

ডাল কেবল এক রাতেই ফুলে ভ'রে যায়—অন্তত বুদ্ধদেব বসু কোনো প্রবন্ধে কেবলমাত্র এইজন্যই একালের ছোটোদের জন্য ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। আর অন্য সব লেখার বেলায় বড়োরা কেবল দূর থেকে তৃষিতের মতো দেখেই স'রে যাবেন না, রীতিমতো এসে জবর-দখল করবেন, ভাগ বসাবেন, অনেক সময় তো মুগ্ধের মতো ছোটোদের হাত থেকে কেড়ে নেবেন বইটি, তারপর নিজেই তন্ময় হ'য়ে যাবেন অস্পষ্ট এক ঊষাবেলায়, যাকে বলি শৈশব, যখন রাঙা হাতে রঙিন খেলেনা পেলে তিনিও রং লাগিয়ে দিতেন মেঘে, জলে ফুলে ও সমীরণে,—জাগিয়ে দিতেন নাচ, গান, সুর,—মাধুর্যের ডালা উপচে সব কিছুর উপর দিয়েই ব'য়ে যেতো লাবণ্যের ঝরনা।

যে-কথাটা বারে-বারেই মনে পড়ে, তা হ'লো বেদনার মতো গভীর এক মাধুর্যের লীলা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শৈশব-সাধনার সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে অন্তর্লীন এই মধুর বিষাদ। এককালে সমস্ত পৃথিবী ছিলো অধিকারে, ধাতু, ধুলো, হাওয়া, পুতুল—সব এককালে হুকুম শুনতো আমার, এখন ক্রমেই যত বড়ো হয়ে গেলাম, ধীরে-ধীরে সব হারিয়ে গেলো। স্বপ্নের মতো, ব্যথার মতো এই হারাবার বোধ বারে-বারে বুকের মধ্যে গুনগুন ক'রে ওঠে, যখনই এই বইগুলির সম্মুখীন হই, আর আকুলতা জেগে ওঠে ফিরে পাবার জন্যে; কিন্তু সেই পাখা কোথায় পাবো, যার সোনালি ঝাপট এই নষ্ট দিনগুলি থেকে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সহজের ভিতর, যেখানে লুপ্ত হয়নি বিশ্বাস করার ও বিস্মিত হবার ক্ষমতা, যেখানে জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেদের মেলার ভিতর করুণার স্রোত এসে বারে-বারে ঢেউ তুলে দিয়ে যায়। আর-কখনো সেই দিন-গুলিকে ফিরে পাবো না—এই বোধটাই ভিতরে বিষাদ ছড়িয়ে দিয়ে

যায় আমাদের জন্য ; যে-বিষাদ ধীরে-ধীরে সব নতুন ক'রে গ'ড়ে দিয়ে যায় আমাদের স্মৃতির ভিতর এক লুপ্ত জগৎ ! হারানো সব স্মৃতি, আশ্চর্য প্রাসাদ আর জাদুর গালিচা, দূর তেপান্তর আর মস্ত রাজার বাড়ি, পাষাণের মিনার আর ধবধবে পক্ষিরাজের ডানার হাওয়া—সব ধীরে-ধীরে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে অন্তহীন ফিতের মতো বেরিয়ে আসে, সব জেগে ওঠে একে-একে, ফিশফিশ ক'রে কথা ব'লে ওঠে পুতুল, পাখি আর ধাতুমূর্তি, পর্দা উঠে যায় ধুলো মাটি আর হাওয়া থেকে। যেহেতু এই অপরূপ সোনার কাঠির স্পর্শ সংগোপনে তাঁর কবিতার ভিতর লুকিয়ে আছে, যার ফলে ঘুমের দেশে জেগে ওঠে জাগরণের কলস্বর, সেই জন্যই মনে হয় আমরা যাকে শিশুসাহিত্য বলি, তা কোনো আলাদা জিনিশ নয়, নয় কোনো খণ্ডিত কি অপূর্ণ কি অলীক প্রদেশ, বরং তার ভিতর যদি পরিণত, পূর্ণ ও সমগ্র জীবনের নানা স্পন্দন, পাঁচকোণা নক্ষত্রের মতো দীপ্তি বিকিরণ ক'রে ওঠে, তা হ'য়ে ওঠে সাবালক, হ'য়ে ওঠে সকলেরই আনন্দের অংশ, জীবনের সম্পদ। এই কথা প্রযোজ্য বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যের প্রতিও ; যে-সাহিত্য আবহমান, চিরকালের উদ্দেশ্যে যা নিবেদিত, যা জীবনের পরম ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে—ছোটোদের প্রথম দাবি শুরু হয় সেই মহাকাব্য থেকে, ধীরে-ধীরে পরিধি বেড়ে যায়, বৃত্ত বিস্ফারিত হয়, ক্রমশ তার অন্তর্ভূত হয় বিশ্বের পুরাণ, রূপকথা, আর সেই সঙ্গে ডন কুইকজোট, রবিনসন ক্রুসো, রবিনহুড, গালিভারের ভ্রমণ-কথা ; তালিকা আরো বাড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু কী দরকার ? ডিকেন্সকে কি বাদ দিতে পারি, কিংবা টলস্টয়কে ? তবু তো এঁরা নিক্তি মেপে কিছু-কিছু শিশু-সেব্য কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু শেক্সপিয়র কি উগো, ওয়াইল্ড, রস্তাঁ—এঁরা ? এই চিরঞ্জীব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না-হ'লে কোনো

শিশুবই অধ্যয়ন কি সম্পূর্ণ হ'তে পারে? আসল কথা, জীবনে কখনো-কখনো এমন মুহূর্ত আসে, যখন সকল ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এক বিপুল অখণ্ডতাবোধের সম্মুখীন হই আমরা। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য সেই বোধ দেয় আমাদের। তার কতকগুলি কারণ ছিলো, সেগুলি লক্ষ্য করাব মতো।

সারা জীবনে অনেক ফরমায়েশি কবিতা রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন কি 'সাধনা'র সম্পাদকি বিভাগের সম্পূর্ণ ভার যখন নিজের হাতে তুলে নিলেন, তখন শুধু কবিতাই নয়, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, এমনকি সাময়িকী পর্যন্ত তাঁকে লিখতে হ'তো। কিন্তু ছোটোদের জন্য যখন তিনি লিখতে গেলেন, তখন বাইরের তাগিদ যতটা না ছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো নিজের প্রয়োজন। এই কথাটাকে ভালো ক'রে বোঝা দরকার।

শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের মধ্যেই এই ধারণাটি প্রচলিত আছে যে, ছোটোরা হলো অবোধ, অপোগণ্ড ও নিঃসাড়, ফলে তাঁরা 'করুণা ক'রে' ছোটোদের জন্য যে-সব জিনিশ লিখে দেন, তা ঠিক এই মনোভাবের ফলেই হ'য়ে ওঠে ভাবালুতায় ভরপুর, এবং ন্যাকাগোছের ভাষায়—অনেক সময় তা প্রায় ইয়ার্কির পর্যায়ে পৌঁছে যায়—তাঁরা যে-সব জিনিশ রচনা করেন তার ভিতর কদর্থে ছেলেমানুষি থাকে। ছেলেমানুষি নামক ব্যাপারটি যদি কারো রক্তের ভিতরে না থাকে, তবে তাকে চেষ্টা ক'রে আয়ত্তে আনতে যাওয়াই বাতুলতা। শিল্পের ভিতর হয়তো অন্য সব বানানো জিনিশ সহ্য হয়, কিন্তু এই শিশুসুলভ সরলতাটিও যদি বানাতে হয়, তা'হলে লিখতে যাওয়ার দরকার কী। কোনো বড়ো, এবং সচেতন, লেখকই

এ-রকম করেন না। যে-রামবাবু আপিশে মস্ত রাশভারি ও ভারিক্কি, তিনি বাড়ি পৌঁছে নাৎনিকে পিঠে ক'রে ঘোড়ার অভিনয় যখন করেন, তখন তা অনেক সময়েই দর্শকের ঠোঁটের কোণে হাসির আভা বিকিরণ করতে পারে বটে, কখনো তাকে আমরা অসহ্য ভাঁড়ামি-পনার পর্যায়ে ফেলি না। কেননা সেখানে শেষ পর্যন্ত আমাদের এটা মানতেই হয় যে, ভালোবাসা ও বাৎসল্য নামক মানবজীবনের দু'টি মহৎ অভিজ্ঞতা ঐ সব অঙ্গভঙ্গির মধ্য থেকে অবিরলভাবে ঝ'রে পড়ছে। কিন্তু যে-সব লেখক ছোটোদের অবজ্ঞা করেন, তারাই তাদের ভাবেন অবোধ ব'লে, এবং ফলে যে-সব বানিয়ে-তোলা ন্যাকা-ভাবের আমদানি করেন তা প্রায়ই রসগোল্লার চটচটে রসের মতো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে, যদিও রসগোল্লার সেই শ্বেত গোলতার মতো স্বাদু ও পুষ্টিকর সামগ্রী তাতে কিছু থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোদের জন্য লিখলেন, সব সময়েই তা জীবনের গভীর থেকে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। নিছকই একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়েছিলো; আমরা জানি 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব ক'টি কবিতাই তিনি রচনা করে-ছিলেন মাতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা দেবার জন্য—সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার ছিলো তা; এবং আরেকটি কারণেও তা সম্পূর্ণ নিজস্ব—যখন সেই মাতৃহারা শিশুদের জন্য তিনি এই আশ্চর্য কবিতাগুলি রচনা করলেন, তখন কি তিনি নিজের বাল্যবেলার সেই বিষণ্ণ অভাব-বোধটিকেই স্মরণে আনেননি। জোড়াসাঁকোর সেই মস্ত বাড়িটিতে ছোটোদের থাকতে হ'তো বাড়ির চাকরদের আওতায়—মায়ের সঙ্গে দেখা হ'তো ক্বচিৎ কখনো। ফলে 'মা' নামক অভিজ্ঞতাটিকে সেই বয়সেই তাঁকে মনে-মনে বানিয়ে নিতে হয়েছিলো; মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর নিজের ছেলেমেয়েদের ভিতর তিনি কি সেই শিশু-রবিকে

আবিষ্কার ক'রে নেননি? 'পুরোনো বট,' 'রাজার বাড়ি', 'কাগজের নৌকা' এই সব কবিতা নিশ্চয়ই এখানে চট ক'রে মনে প'ড়ে যাবে আমাদের, যারা চাবিকাঠির মতো একটি রহস্যময় জগৎ আমাদের কাছে উন্মোচিত ক'রে দেয়, সেখানে ধীরে-ধীরে আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারি ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকে, তিনি শীতকালের শেষরাতে গায়ে শাল জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শিশিরের শব্দ শুনতেন, যিনি জল পড়া ও পাতা নড়ার অবিরল দোলার মাঝখানে দেখেছিলেন ছন্দের লীলা। 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' এইসব পড়তে-পড়তে সবচেয়ে প্রথমে আমাদের কাছে যেটা মনে হয়, তা হ'লো এই যে এই কবিতাগুলির নায়ক একজন ভাবুক শিশু, যে, কল্পনায় এক আলোছায়ার জগৎ তৈরি ক'রে নেয়, যেখানে ইচ্ছে-মতো মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার জন্য কখনো হওয়া যায় চাঁপা, কখনো বা হ'য়ে ওঠা যায় জলের মধ্যে ঢেউয়ের লীলা। রোজ যা তা কত কী ঘটে, তার বিরুদ্ধে, এই অতিসাধারণ আকর্ষণহীন তুচ্ছ দৈনন্দিনের বিরুদ্ধে, সে মনে-মনে তৈরি ক'রে নেয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কাল্পনিক বিশ্ব, যেখানে আকাশ হ'লো মা, আর চাঁপাগাছ হ'লো সেই ভাবুক শিশুটি। রবীন্দ্রনাথ বলতে আজকের দিনে আমরা যাঁকে বুঝে থাকি, তাঁর সব প্রবণতাই সংগোপনে এই সব কবিতার ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে আছে, আর হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে তা যখন রশ্মিজ্বলা রক্তিম বিচ্ছুরণ পাঠিয়ে দেয়, তখন আমরা সচমকে নতুন ক'রে দেখতে পাই জানলা খুলে গেলো দূর-কালের দিকে, আর রাশি-রাশি হাওয়া পাঠিয়ে দিলো অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা, যার আঘাতে ফুলে-ফেঁপে উঠলো কাগজের নৌকোর অলৌকিক পাল আর আমরা নতুন ক'রে যাত্রা শুরু করলাম দিগন্তরের দিকে। এই কবিতাগুলির ভিতরে যে কেবল শিশু-নায়কটিই কবিত্বের আগুনে প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে তা-ই

নয়, যা কিছু আছে প্রাকৃতিক ও নিশ্চেতন, রবীন্দ্রনাথ তাদের ভিতরেও আরোপ ক'রে দিয়েছেন নিজেকে, ফলে এমনকি মস্ত লম্বা তালগাছ সুদ্ধ এক ভাবুক ও বিষণ্ণ কবি হ'য়ে আমাদের কাছে দেখা দিলো, ফুল হ'য়ে গেলো প্রজাপতি, মিটমিট জোনাকির মতো ছোট্ট হালকা পাখায় উড়ে-উড়ে বেড়ালো প্রদীপের আলো, আর পুকুরের জল তার ডানা কাঁপিয়ে আকাশে উড়ে গেলো মেঘ হ'য়ে। কোন সেই সোনার কাঠি, যার স্পর্শ এই রূপান্তরকে সম্ভব ক'রে তোলে, এই প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না আমাদের, চোখ বুজে ব'লে দিতে পারি এই সোনার কাঠি হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবি—প্রথমত কবি, এবং প্রধানত কবি। যদি তিনি এই সব রচনার পরতে-পরতে মিশে না-থাকতেন, যদি, রবীন্দ্রনাথ—বালসেব্য কবিতা রচনার জন্য—অন্য এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এই সব কবিতা এত বিচিত্ররূপে অন্তহীন ও ভোগ্য হ'তো না। যেহেতু স্বয়ং তিনি আছেন, তাই আছে অবারিত দিগন্তের ডাক, যা পরে জগতের আনন্দ যজ্ঞে এক বিপুল আমন্ত্রণলিপিকার মতো দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়লো। যেহেতু তিনি আছেন, তাই আছে 'তুই আমির' সেই আশ্চর্য দ্বন্দ্ব, যেখানে নীড়ে আর আকাশে, কুলায় আর কালপুরুষে, রূপে আর অরূপে, দিগন্তে আর অন্তঃপুরে অবিরাম কানাকানি চলে এক গোপন ভাষায়[১]। ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে

---

১ 'শিশু ভোলানাথে'র, সেই ছোট্ট কবিতাটি যার ভিতর 'দুই রকমের দুই খেলা'র কথা আছে, যেখানে উন্মোচিত হয়েছে 'আকাশ-ওড়া' আর 'ভুঁই খেলা'র গোপন কানাকানির মূল রহস্য তা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সেই বিখ্যাত তত্ত্ব-কথার চাবিকাঠির মতো কাজ করতে পারে, যে-তত্ত্বের নামকরণ করা হয়েছে সীমা ও অসীমের প্রণয়লীলা।

তিনি কৌটোর ভিতরে গন্ধের মতো সম্পূর্ণ নিজেকে ভ'রে দিয়েছেন, কিংবা তাঁর নিজের উপমা ব্যবহার ক'রেই বলা যায়, যে, যেন জলের ভিতর ঢেউ হ'য়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন নিরবধি সমুদ্রের দিকে। কোথাও নিজেকে সংকুচিত করেননি এতটুকু, হারান নি তাঁর সচেতনতা, তাঁর অস্মিতা, ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রসার—বরং তাকেই নিংড়ে আরো মোলায়েম ক'রে একেবারে যেন সারাৎসারে পরিণত ক'রে দিয়েছেন।

৩

এ-রকম হবার আরেকটা কারণ ছিলো।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল 'দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য' ; সেই জন্যই এই সব রচনা ছিলো তাঁর শৈশব-সাধনারই অন্তর্ভূত, যে-সাধনার মূল কথা হ'লো, 'শিশু হবার ভরসা আবার জাগুক আমার প্রাণে, লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে'। এই উৎস থেকেই সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছিলো তাঁর প্রকৃতির সাধনা, গানে কবিতায় গল্পে যার অজস্রতা আমাদের সব সময়ে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধেও একই বিচ্ছেদ-বোধ তাঁর 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তির ভিতরেও বারে-বারে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য এক অসীম আকুলতা। বাইরে থেকে কুড়িয়ে এনে কবিতার ভিতর পুরে দেননি তিনি, ভিতর থেকে তা হ'য়ে উঠেছে নিজে-নিজেই ঘুমের ভিতরে স্বপ্নের মতো, আর সেই জন্যেই এই পৃথিবী যেমনভাবে দিনে-দিনে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কাছে, তারার ভাষায়, জলের গলায়, মেঘের রঙে, গাছের গড়নে, ফুলের গানে যেমনভাবে বারে-বারে ডাক পাঠিয়েছে তাঁর কাছে,

ঠিক সেই কথাটিই তিনি অফুরন্ত বার অবারিত ক'রে ব'লে দিয়েছেন। এই জন্যই তাঁর তালগাছ রক্তে মাংসে সজীব হ'য়ে ভাবুকতায় তন্ময় হ'য়ে পড়ে, এই জন্যেই তাঁর বাদল দিনের 'প্রথম কদম ফুল' একটি আরক্তিম ও স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডে পরিণত হ'য়ে যায়। বিচ্ছেদই যদি না-থাকে তাহ'লে বারে-বারে কেন ডাক আসবে? প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারছেন না ব'লেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার আকুলতা তাঁর এত প্রবল। শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লেই তাঁকে তৃষিতভাবে শিশু হবার সাধনা করতে হয়। সীমার ভিতরে আছি ব'লেই তো অসীমের ডাক শুনতে পাই, না-হ'লে অসীমকে আবার অসীম ডাকবে কি? শিশুকে আবার শৈশব-সাধনা কবতে হয় নাকি? বনের গাছপালাকে কি কখনো চেষ্টা করতে হয় গাছ হবার জন্য? সমালোচনার ছুরি-কাঁচি দিয়ে তাঁর রচনাকে যে মাপ-মতো কেটে নেয়া যায় না, তার কারণই হ'লো রচনার ভিতর ভাঁজে-ভাঁজে যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কোনো লেখাতেই তিনি নিজেকে চেপে, ঢেকে প্রকাশ করতে পারেন নি, তাঁর ব্যক্তিত্ব এতই জলের মতো যে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে স্রোতের ধারায়। সেই কারণেই সদর স্ট্রিটের বাড়িতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যেদিন হ'লো সেদিন থেকেই বিচ্ছেদের এক কূলপ্লাবী বোধে তাঁর বিষাদ সমস্ত রচনার ভিতর ছড়িয়ে পড়লো—আর তাঁর রচনার ভিতর বর্ষার কালো মেঘের এত যে সমারোহ, মেঘলা আকাশ থেকে এত যে ছড়িয়ে পড়ে চাপা এক বিষণ্ণ আভা, তাই কি এই আদিগন্ত ব্যাকুলতার দিকে ইঙ্গিত করে না? তাঁর রচনার সর্বত্র এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছড়িয়ে আছে—এটাই হ'লো উৎস, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে আকুল নদী, জলে সেখানে ঢেউ জেগে ওঠে, আর ঢেউয়ের ভাষায় যেখানে দূরের গান।

এই কথাটাও স্পষ্টভাবে তিনিই ব'লে গিয়েছিলেন, 'যাত্রী' নামক গ্রন্থের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি', অংশে [১] : সেখানেই বিশদ ভাবে তিনি বলেছেন যে, এই কবিতাগুলি লিখেছেন শুধুমাত্র নিজের জন্য—এগুলি হয়েছে তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন। বিশ্বের শিশু-সেব্য রচনার মধ্যে যে-গুলি চিরঞ্জীব, তারা সকলেই তা-ই, সব সময়েই তারা জীবনের মূল্যায়ণ করে, বাণী পাঠিয়ে দেয় মানবাত্মার উদ্দেশে, চিরকালে ও নিখিলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি একই সঙ্গে হাসি-কান্না কৌতুকে-বিষাদে এত বিচিত্র ও বিপুল, এত হালকা, নির্ভার ও বিশ্লেষণবিমুখ যে তা যেন প্রায় অপার্থিব হ'য়ে উঠেছে—স্বর্গের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় যেন তারা, ছড়িয়ে দেয় এমন বিশ্ব-জোড়া স্নেহ ও বাৎসল্যের ঢেউ যে, আমরা তার ভিতর অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ, নন্দিত ও সুকুমার হ'য়ে উঠি। এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, ঠিক এমন কবিতা কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ; 'অপাপবিদ্ধের গান' ও 'অভিজ্ঞতার গান' এই দুই জোড়া-বইয়ের নাম মুহূর্তে আমাদের মনে প'ড়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম ব্লেকের কবিতাগুলিকে তাঁর তুলনায় অনেক বেশি 'হিংস্র' ব'লে মনে হয়, এবং অনেক বেশি সরলীকৃত—অপাপবিদ্ধের সরলতার পরেও যেহেতু অভিজ্ঞতার বিপুল রক্তপাত থাকে, সেই জন্য ব্লেক প্রায়

১ 'দেওয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি ক'রেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।'—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি : রবীন্দ্রনাথ।

নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যান—সদর্থেই এই নিষ্ঠুরতা, তিনিও চেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মতোই—সর্বজীবে ও সর্বভূতে তাঁকে প্রত্যয় করতে, কিন্তু এখানেই হয়তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মূল বিরোধ, যার ফলে বনের ভীষণ বাঘের জ্বলজ্বলে রূপকে—মেষপালক ও শুভ্রপশমাবৃত মেষপাল সত্ত্বেও—কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না। খ্রীষ্টান ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্লেকের দিব্যদৃষ্টির, তৎকালে, বিরোধ বেধেছিলো—এ-কথা সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতে পাপবোধ প্রবল ব'লেই শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্লেকের কবিতায় এত বেশি হারিয়ে-যাওয়া ছেলেমেয়ের ভিড়, যারা শীতে-কুয়াশায় রক্তে ও মজ্জায় কোনো এক হিংস্র ভীষণতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরাদৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছিলো সেই জগৎ-পারাবারের তীর, যেখানে ছেলের দলের মেলা—সেখানে ভীষণ ঢেউও শেষ পর্যন্ত পুজোর মন্ত্র বলে : সেখানে আকাশের ঝড় সুদূর জলে তরী ডুবিয়ে দেয় আর মরণদূতেরা উড়ে চলে বটে, কিন্তু শেষ অবধি সারা বেলা ফেনিল ঐ সুনীল জল নাচে ; বালুর ঘর পাতার ভেলা, খেলার তরী, সবকিছুই ক্ষণস্থায়িত্বের ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত নিখিল প্রাণের লীলাস্পর্শে জগৎ-পারাবার ভ'রে যায় ঢেউয়ের ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট মেয়ে যখন বলে 'হারিয়ে গেছি আমি', তখনও ব্লেকের সঙ্গে তাঁর তফাৎটা স্পষ্টই থাকে স্নেহে, বাৎসল্যে, করুণায়, যার ভিতরে গোপনে কাজ ক'রে যায় এক ঝলমলে কৌতুকের প্রবণতা।

১ শুধু বোধহয় গল্পসল্পের শেষ গল্পটি এবং তার সঙ্গে যুক্ত কবিতাটির ভেতর একজন রাগি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘ'টে যায় যিনি মানুষের হিংস্রতা ও নির্মমতায় ক্ষুব্ধ, চঞ্চল, উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। নাহ'লে 'রাজর্ষি'র স্বপ্ন স্বরূপ যে প্রশ্ন তাঁর মনে জাগিয়েছিলো, 'এত রক্ত কেন ?' সে প্রশ্নকেও তিনি অন্তিম বিশ্বাসের চাপে অন্য এক দিগন্তের সন্ধানী করিয়েছিলেন।

৪

এই কৌতুকের প্রসঙ্গে সকলেরই নিশ্চয়ই বহু রচনার কথা মনে প'ড়ে যাবে, 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকের' চপল সুষমা বাদ দিলে, যে-বিষয়ের পুরোধা হয়ে আসে কাহিনীর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সবচেয়ে প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে যে, যারা এবং যে-সব বিষয় তাঁর কৌতুকের লক্ষ্য, তারাও তাঁর অসীম স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র ভিতর যাদের তিনি ঠাট্টা করেছিলেন, তাদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি অসীম ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলো। যখন বিষয় আরো গুরুতর, এবং বিশ্বমানবের একটি চিরন্তন সমস্যাকে স্পর্শ করলো, তখনও তিনি তাঁর সম্মুখীন হয়েছেন স্নেহের সুষমা নিয়ে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র উদ্দেশ্যময়তা এবং বিরাট বক্তব্যটি পরে নানা জায়গায় তাঁর রচনায় ঘুরে-ফিরে এসেছে, এবং কখনো-কখনো তাঁর কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠেছে চাপা, গম্ভীর ও ভারাতুর; কিন্তু এখানে, হয়তো ছোটদের কথা মনে ছিলো ব'লেই ঝলমল ক'রে উঠেছে তাঁর ভাষা: দেখেই মিল আর ছন্দের কৌশলে আমরা চমকে যাই, চমকে যাই কবিতার ভিতর কথা বলার অচল স্রোতোময়তার ব্যবহার দেখে, ঘরোয়া ও আটপৌরে ভাষায় স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে-ভাবে তিনি মূল উদ্দেশ্যের সম্মুখীন হলেন, তা আমাদের মুগ্ধের মতো আটকে রাখে। আর যা আকর্ষণ করে, তা হ'লো সেই অসীম ক্ষমা ও স্নেহ, যা নিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেও বাণী আছে মানবত্তার উদ্দেশে, মস্ত এক জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন বিকিরণ ক'রে দিয়েছে দূরস্পর্শী বহু রশ্মি—আর এই উপায়টিই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর প্রায় সব রচনায়। কবিতাগুলির কথা তো আগেই একটু-একটু আলোচনা করেছি, কিন্তু 'সে', 'গল্পস্বল্প' প্রভৃতি

শেষ জীবনের রচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'সে' ও 'গল্পসল্পে'র ভিতর কেবল বিশেষ গল্পরূপের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে না, সেখানে সাহিত্য ও শিল্পের নানা সূত্রও তিনি কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যে-ভাবে 'সে' আরম্ভ হ'লো, তা-ই দেখেই হয়তো অনেক অনভ্যস্ত শিশু-পাঠক বই সরিয়ে রেখে দেবে—কিন্তু একটু দেখলেই,—যেখানে 'সে' এসে হাজির হ'লো, সেখান থেকেই —মস্ত এক টান অনুভব করা যায়। যেখানে 'সে' এসে আজগুবি ও খেয়াল রসের রচনার সংজ্ঞার্থ ব'লে দিলে, সেখানে 'মহীয়ান আবোল-তাবোল'-এর মূল কথাটি গল্পের ছলে বলা হ'য়ে গেলো। বিশেষ ক'রে, 'সে'র দেহ বদলের অভিজ্ঞতাটি যে এক পরম ভোগ্য জিনিশে পরিণত হ'লো, তার কারণই হ'লো আগে আমরা এই রচনাকে উপভোগ করার মূল সূত্রগুলি পেয়ে গেছি। 'গল্প-সল্প'তেও এইভাবে প্রায় সবগুলি গল্পের সূচনায় ধীরে-ধীরে জীবন ও শিল্পের কতিপয় মূল সূত্রকে ব্যক্ত ক'রে দেয়, যা অভিনিবেশ সহকারে খেয়াল করলে, এই পাগলের দলের ভিড়ে বহুস্তর অর্থময়তাকে আমরা আবিষ্কার ক'রে নিতে পারি। কিন্তু দুটি বইই মাঝে-মাঝে বিষণ্ণ হ'য়ে যায়, সুকুমারের অন্তর্ধানের পর 'সে' প্রায় বিষণ্ণ ও 'ট্রাজিক' একটি উপন্যাসে পরিণত হ'য়ে যায়, এবং দুটি বইয়ের মধ্যেই ধীরে-ধীরে শ্রোতৃদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া লক্ষ্য ক'রে নিতে পারা যায়। এই বই দুটির সঙ্গে মনে পড়ে 'খাপছাড়া' 'ছড়া' ও 'ছড়ার ছবি'—এই বই ক'টির ভিতরেই আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক সচেতন এক প্রতিভাবান 'বৃদ্ধ' লেখককে—যিনি অবসরকালের আত্মবিনোদনের জন্য খেয়ালি হ'য়ে দেখা দিলেন নতুনতর এক ভঙ্গিতে।[১] লোভনীয়, সন্দেহ নেই, এবং উপভোগ্য ; কেননা এখানেও যখন ধীরে-ধীরে বিষাদের সান্নিধ্য

লাভ করি, তখন ধীরে-ধীরে দেখতে পাই আড়ালে একজন 'সচেতন প্রতিভাবান' ছাড়াও আরেকজন ব্যক্তি আছেন, যিনি বিষণ্ণতার পূজারী—যিনি আমাদের ব্যথার মূল্য বুঝিয়েছেন।

এই বেদনার প্রসঙ্গেই আসে তাঁর 'রূপকথা'গুলি, যে-গুলিতে স্পষ্টভাবেই উন্মোচিত হয়েছে ঐন্দ্রজালিক এক সম্মোহন। এখানেই স্মরণীয় সেই আশ্চর্য যুগান্তকারী গ্রন্থ 'লিপিকা', যার মধ্য দিয়ে তিনি জগৎকে নতুনভাবে উপস্থিত ক'রে দিলেন।

৫

'পরির পরিচয়', 'দুয়োরানীর সাধ', 'ভুল স্বর্গ' এমনি অসংখ্য রূপকথা আমাদের মনে প'ড়ে যাবে, যার কোনো-কোনো আভাস ইতিপূর্বে দেখেছি 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য়, ও পরে, 'গল্পসল্পে'। 'গল্পসল্পে'র 'রাজরানী' ও 'চন্দনী' যেমন, তেমনি অন্যত্রও—সর্বত্রই —রূপকথার ভিতর তিনি পূর্ণ পরিণত জীবনের ওজন পুরে দিয়েছেন, যার সাক্ষাৎ 'তাসের দেশ' বা 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'ও বিদ্যমান। পোষমানা, আইন-মানা, নিক্তি-মাপা, কাঠখোট্টা জীবনের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রূপতা তিনি চিরকাল প্রকাশ করেছেন, যে-জীবনযাত্রার ভিতর প্রাণহীন কতকগুলি ভদ্রতার আড়ালে হৃদয়-বৃত্তির বিরোধী অমার্জিত মন ও অশালীনতার শাণিত ও বক্র নখর বিদ্যমান, তাকেই রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন। 'তোতাকাহিনী'ও নিশ্চয়ই সকলে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করবেন। কিন্তু এই রূপকথার আলোচনায় দিনেমার-লেখক হান্স আণ্ডেরসেনের নাম উল্লেখ করতে হয়।—বিশেষ ক'রে ছদ্ম-শালীনতার বিরুদ্ধে হান্স আণ্ডেরসেনের বিদ্রূপতাও স্মরণীয়। কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেনের গল্পে যখন রাজপুত্র শূকরপালকের ছদ্মবেশে রাজকন্যার মুখোমুখি হন, তখন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজকন্যা দেখে

রবীন্দ্রনাথের রাজার যে-ভাবে মোহভঙ্গ ঘটেছিলো, তারও সেইভাবে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজা পরিশেষে রানী হবার যোগ্য একটি মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যে-কালে ঠাণ্ডা দেশের এই রাজপুত্র এই হৃদয়হীন রাজকন্যাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আঘাতে বিপর্যস্ত ক'রে দেন। হান্স আণ্ডেরসেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গির এই তফাৎটি আবার য়ুরোপীয় মানসতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্তের মৌল বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করে। হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপকথার তুলনা নানা কারণে হ'তে পারে। কেননা তুজনেই এই যুগে—পরি ও ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব যে-কালে মানা হয় না—মৌলিক রূপকথা রচনা করেছেন ;—অস্কার ওয়াইল্ড, সেলমা লাগেরলোফ, অঁাতেয়ান ত্ম সাঁতেকজুপেরি, এবং আমাদের দেশের অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু এঁদের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের রূপকথার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে এইসব রূপকথার ভিতর দিয়ে নিখিল চিত্তের উদ্দেশে তাঁরা বাণী পাঠিয়েছেন; —আধুনিক যুগের সমস্যা ও চিরকালীন সমস্যা—উভয়কেই তাঁরা স্পর্শ ক'রে গেছেন। বিশেষ ক'রে আণ্ডেরসেন দেড়শতাধিক

১ '(অবনীন্দ্রনাথের) "ভূতপত্রীর" সঙ্গে "সে", আর (সুকুমার রায়ের) "আবোল-তাবোলের", সঙ্গে "খাপছাড়া"'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে ; আগের বই তুটির স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই, এরা বড়ো বেশি সাহিত্যিক, বড়ো বেশি সচেতন—এমনকি আত্মসচেতন ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক যে-মহাকবি তিনি মাঝে-মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নতুন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশি হই। সুকুমার রায়ের—অবনীন্দ্রনাথের "সে"-র মুখের কথা দিয়েই বলছি—"কেরামতিটা কম ব'লেই সুবিধা" ছিলো।'

—বাংলা শিশুসাহিত্য (সাহিত্যচর্চা) : বুদ্ধদেব বসু

রূপকথা রচনা করেছিলেন ব'লে তাঁর কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রূপকথাগুলির ভিতর আণ্ডেরসেন নিজেকে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছেন, তুলে দিয়েছেন ধুলোমাটি গাছপালার উপরকার আবরণ, যার ফলে সপ্রাণভাবে সবাই এসে আমাদের কাছে কথা ব'লে যায়। দুঃখকষ্ট, আঘাত, মোহভঙ্গ, ভালবাসা, বিষাদ, বেদনা, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য, শাস্তি এবং সর্বোপরি ঈশ্বর—এইসব মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে সেখানে তিনি কথা বলেছেন নিজের সঙ্গে, যার ভিতর তিলে-তিলে আমরা যাঁকে অনুভব ক'রে নিই, তিনি আণ্ডেরসেন স্বয়ং,—নিঃসঙ্গ, একলা, বিষণ্ণ এবং মহীয়ান।[১] এবং সর্বোপরি, নিষ্ঠুরও। 'লাল জুতো', 'ছায়া' কিংবা রুটি যে মেয়েটি মাড়িয়েছিলো, তার গল্প—দ্বন্দ্বে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত, 'ছায়া'র ভিতরে পাপ ও পুণ্যের সংঘাত অতিরিক্ত প্রবল, আর কারেন বা ইঙ্গের শাস্তি যে এত নিষ্ঠুর, তার কারণই হ'লো খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে পাপবোধ প্রবল, আর সর্বদাই শেষ বিচারের চেতনা কাজ ক'রে যায়। রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠুর কোনো লেখাই এত শাস্তির দিকে ঝুঁকে পড়েনি। যে আণ্ডেরসেনকে পাই 'বিশ্রী হাঁসের ছানা' কি 'জলকন্যাদের ছোটোবোন' 'বুড়ো ওকের শেষ স্বপ্নে' কি 'বড়োরাস্তার বুড়ো-বাতিতে সেই নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, বিধুর আণ্ডেরসেনই রূপকথার রবীন্দ্রনাথের সহগামী। 'পরির পরিচয়' কি 'দুয়োরাণীর সাধে'র আকাশ-স্পর্শী বিষণ্ণতা কেবল কোমলতা ও অনুকম্পাতেই সহন-যোগ্য ; তারা যদি রূপকথা না-হ'তো, যদি তাদের নিয়ে এক আস্ত মাপের উপন্যাস লিখতেন তিনি, তাহ'লে সেই বিষণ্ণতার চাপ আমাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হ'তো। যেমনভাবে ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে মা জন্মের রহস্য ভেদ করেন, ব্যক্ত করেন ভালো-বাসার অসীমতাকে ('ইচ্ছে হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে') এবং শেষকালে তাকে চিরকালের ইচ্ছের সঙ্গে মিশিয়ে দেন, 'তেমনিভাবে

রূপকথার মায়ালোকে গালিয়ে দিয়েছিলেন ব'লেই এই সমস্ত বয়স্কজনের পক্ষে উপভোগ্য সামগ্রীও ছোটোদের উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। হয়তো মনের ধাতই এইরকম ছিলো—স্নেহ, করুণা, বাৎসল্যের দ্বারা পরিপূর্ণ। সর্বভূতে ও সর্বজীবে দয়া—এই বোধটিই পরতে পরতে মিশে আছে সব রচনায় —আণ্ডেরসেনের রচনায় যেমন। গ্রিম, শার্লপেরো বা দক্ষিণা রঞ্জনের মতো তাই তারা সব অর্থেই কেবল শিশুসেব্য নয়, মানব-জীবনের অভিজ্ঞা হ'য়ে উঠেছে। তা যে হ'তে পেরেছে, তা কেবল এইসব রচনার ভিতর আমরা পুরোপুরিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাই ব'লে ; ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে তিনি যদি নিজেকে টুকরো ক'রে, কেটে কেটে ছেঁটে দিতেন, তাহলে তা সম্ভব হ'তো কিনা সন্দেহ। ফুলের পাপড়িতে যেমনভাবে ভাঁজে ভাঁজে গন্ধ মিশে থাকে, তেমনি এইসব রচনার পরতে পরতে তিনিই আছেন। দূরের থেকে সৌরভে ভ'রে উঠে, স্নিগ্ধ ও লজ্জিত হই, তারপর দেখি আকুল হ'য়ে তা চ'লে গেলো দূরের দিকে। আর এত নির্ভর, এত স্বচ্ছ, এত বিকীর্যমান ও অসীমস্পর্শী যে আমরা অবাক হ'য়ে কেবল তাকিয়ে থাকি, আর কোন এক পরিমল ছড়িয়ে যায় পবনে, যেন সোনার কলস নদীর শ্রোতে অকারণে ভেসে গেলো দূরকে লক্ষ্য ক'রে।

১। গর্কির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে টলস্টয় হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার মূল চাবিকাঠিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আণ্ডেরসেনের রূপকথা প'ড়ে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাই, যিনি জীবনের সব ব্যর্থতা সহ্য ক'রে অবশেষে ছোটোদের কাছে এসে নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা যে কী বিপুল ছিলো, তার প্রমাণই এটা—কেননা ছোটোরা কখনো—ভদ্রতার বালাই রাখে না ব'লে—কাউকে ক্ষমা করে না, যদি কাউকে অপছন্দ করে তো চিরকালের মতো অপছন্দ করে। তবু যে আণ্ডেরসেন ছোটোদের কাছে গিয়েছিলেন, তার কারণই হ'লো এক ব্যর্থতা বোধ ও নিঃসঙ্গতা।

রবীন্দ্রনাথের মন

অজিত মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে শিশুমন ছিল অবাধ সে মন যেন প্রজাপতির ডানায় চিরকাল নিজের খেয়াল বশে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। পৃথিবীর ফুলে ফুলে, পাখিপাখালিতে, সবুজে লালে, সমুদ্রে পাহাড়ে, এমন কি তোমার আমার মনের বেদনার জগতেও সেই প্রজাপতির মত চঞ্চল মন ডানা ছুঁইয়েছে, স্পন্দনে স্পন্দন মিলিয়েছে, দুঃখে চোখের জল ঝরিয়েছে, আবার আনন্দে হেসেও উঠেছে। তাঁর স্পর্শকাতর মন বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ হয়ে পড়েনি।

আমরা সাধারণত তাঁকে সাদা চুল দাড়িতে ঢাকা এক গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি হিসেবেই দেখে থাকি ছবিতে।

সাধারণ চোখে হয়ত মনে হবে, ভদ্রলোক কী কঠোর গম্ভীর। রঙের রেখা মাত্র নেই, সাদায় প্রশান্ত। অথচ সকলেই জানে বুড়ো বয়সে ভদ্রলোক একটা তালপাতার বাঁশির জন্য একটি ছেলের বেদনাকেও ধরে রেখেছেন তাঁর নিপুণ কলমের আঁচড়ে। বুড়ো বয়সে তিনি ছোটদের জন্য যে সব কবিতা গল্প নাটক লিখেছেন তাতে অনেক ভদ্রলোকই বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এবার ফুরিয়ে গেছেন আর লিখতে পারছেন না, তাই বাচ্চাদের জন্য আবোল তাবোল লিখে চলেছেন।

কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে ছেলেমানুষী সজীবতা বেঁচে ছিল সেটা দেখতে পান নি।

রবীন্দ্রনাথের রূপবান শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছিল, অবয়বে তিনি যুবক প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ হয়েছিলেন, সেটা বাইরের খবর। কিন্তু মনে মনে চিরশৈশব ও চির কৈশোর তাঁকে সবুজ কাঁচা ও ছেলেমানুষ করে রেখেছিল। বাচ্চাদের দুরন্তপনায় তাঁর অন্তর অস্থির আবেগে সব সময় মশগুল হয়ে থাকত, সে খবর তাঁরা রাখেন নি।

তিনি যখন তখন শিশুদের সঙ্গে তাদের মত হয়ে মিশে যেতে পারতেন। তাদের মত আবোল তাবোল কল্পনার রাজ্যে দিশেহারা হতে পারতেন। শিশুদের বীরত্ব পূজায় অংশ গ্রহণ করতেন। তাদের মত অদ্ভুত চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। শিশুরা যেমন খেলার সময় উদ্ভট কিম্ভূতকিমাকার নাটক নিজেরাই ঘটনাস্থলে রচনা করে অভিনয় করে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি শিশুদের ধারণা মাফিক ছোট বড় নাটক রচনা করেছেন।

শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় বা তাদের জন্য কিছু রচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের বাস্তব বয়স কিছুমাত্র অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ শিশু হয়েই যেন শিশুদের জন্য লিখেছেন।

শিশু মনের কল্পনা শক্তি অসীম, সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করে অসামান্য জগত সে কল্পনা শক্তি সহজেই সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন অবস্থায় তার গতিবিধি স্বচ্ছন্দ, অবশ্য তাদের ধারণা অনুযায়ী। বয়স কালে মানুষ শিশু মনের সে কল্পনা শক্তির যাদু থেকে বঞ্চিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান মানুষ সঞ্চয় করে তারই মাপকাঠি দিয়ে জীবনের বিচার করে। ভবিষ্যতের সম্ভবনাকে অতীতের ফিতে দিয়ে মাপতে চায়। কী বর্তমান কী ভবিষ্যৎ কোনখানেই বয়স্ক মানুষ কল্পনা শক্তির সাহায্যে ধ্যান ধারণার ফাঁকগুলো ভরাট করতে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র অভিজ্ঞতার ক্রীতদাস কখনো হন নি। কল্পনাশক্তির যাদুমন্ত্র কখনো বিস্মৃত হননি। তিনি কল্পনায় বিশ্ব সংসারের অজস্র বস্তু ও ভাবের রূপদান করেছেন। মনে তিনি শিশু ছিলেন, শিশুদের কল্পনা শক্তি তাঁর আমৃত্যু সচেতন ছিল। এ সংসারের ছোট্ট আলোড়ন তাঁর কল্পনাপ্রবণ স্পর্শকাতর শিশু মনের তারে সুরধ্বনি তুলেছে।

ভোরের পাখির গান

রমেন দাস

ঘুমন্ত পৃথিবীটা সবে মাত্র জেগে উঠেছে। সারা গা থেকে অন্ধকারের চাদরটা ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। ভোরের পাখিরা গাইছে গান। সুরে সুরে দূর-দিগন্তে জাগছে সাড়া। সাড়া জাগছে গাছে গাছে ; বনে-উপবনে। শিরশির করে উঠছে ঘুম-ঘুম গাছের পাতারা। পূব-আকাশের রাঙা আভা ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত পৃথিবীর গায়ে। তারও আগে কে যেন সূর্যের খানিকটা রঙ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ফুল-বাগিচার ফুল-কলিদের সর্বাঙ্গে। তাই ভোরের আলোর গন্ধ পেয়ে তারাও হেসে উঠেছে।

হেসে উঠছে ফুল-কলিরা। হাসি-খুশী ভরা ফুলে ফুলে অলিদলের সে কী ভিড়। আর তারই সঙ্গে ভিড় জমিয়েছে শেষ রাতের ঘুম-ভাঙা শিশু-কিশোররা। হাসি-আনন্দে, প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছে শ্যামল বন-বীথি।

ওদিকে সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রবি যেমন আপন রঙে রাঙা হয়ে উঠছে—আশ্রম-অঙ্গনের ছোট্ট কাননে বসেও বিশ্ববন্দিত রবিকবি তেমনি আপন সাধনায় মগ্ন। হাতের লেখনীতে মনের আবেগ আর প্রাণের ছন্দ লাগিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি নানা সুরের, নানা ছন্দের কাব্য-গাথা। নিস্তব্ধ নির্জন অঙ্গনে কেউ কোথাও নেই। শুধু দুই রবি। আকাশ আর মাটিতে অপূর্ব মিলন। দুই রবির স্পর্শে যেন চঞ্চল-অধীর হয়ে উঠেছে ভোরের বাতাসও। তাতেও নানা ছন্দের ছোঁয়া—প্রাণের মায়া।

: কে, কে তোমরা? পালাও, পালাও! অভাবিত চাপা কণ্ঠ শুনে কবি চমকে উঠলেন। কবিগুরুর সমস্ত ধ্যান-ধারণায় যেন একটা বাধা পড়লো। কে পালাবে, কেন পালাবে—হাজারো জিজ্ঞাসায় কবির হৃদয়ে কাঁপন লাগে। এ-যেন মহাকাব্যে ছন্দ-পতন, মহাসঙ্গীতের সুর-বিচ্যুতি। বিস্মিত কবি তাই কৈফিয়ত তলব করে পাঠালেন। বললেন: "ডেকে আনো পালিয়ে যাওয়া সকলকে। তুমিও এসো ওদের সঙ্গে।"

এলো। সবাই এলো। শেষ-রাতে তাড়া-খাওয়া সব ছেলে-মেয়েই এলো। সকলের চোখে মুখেই ভয়ের ছাপ, ভাবনার ছবি। যেন কত জীবনের অপরাধী। শাস্তির অপেক্ষায় তাই সবাই হেঁট মাথা। এমন সময়—

: ঐ ভোরে তুমি কেন ওদের অমন করে তিরস্কার করেছিলে? কী অপরাধ করেছিলো ওরা?

: গুরুদেব, আপনি তখন নিরালা পরিবেশে নীরব সাধনায় ব্যস্ত। ওরা আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল—ফুল তুলে সদলবলে গোল করে ফিরছিলো। পাছে আপনার সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে, তারই জন্যে ওদের পালাতে বলেছিলাম। ওরাও তাই সব বুঝে ছুটে পালিয়েছিলো!...

কবি-শিষ্যের কথা শুনে বিশ্বকবি এবার হাসলেন স্মিতহাসি। তারপরই আবার ভাব-গম্ভীর।

বললেন: হুঁ—বেশ তো, গাছে গাছে ঐ যে শত পাখির কল-কাকলি, কাল সকালে তা কি তুমি বন্ধ করতে পারবে? ওরা কি শুনবে তোমার মানা? জানি, কোনদিনই তা সম্ভব হবে না। প্রকৃতির নিয়মে ওরা গান গাইবেই। ওদের প্রাণের আবেগ রুদ্ধ করবে কোন্ শাসন? কারুর শাসনই ওরা শুনবে না। সাধনায়

ওরা নিরলস, নির্ভয়, নির্ভাবনা। তাই তো ওদের আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে ওদের সমবেত প্রাণের ঐক্যসুর, মনের মিলন। তাই ঐ পাখিদেরই মত এইসব আশ্রম-শিশুর ভোর রাতের আনন্দ-কলতানের মধ্যেও আমি খুঁজে পাই বিশ্ব-মানবের মিলন-সুর। তাই তো ওদেরও আমি ভালোবাসি—যেমন ভালোবাসি ভোরের পাখির কলকাকলি! তাই অমন তিরস্কার করে আর কোনদিনই ওদের প্রাণের আবেগে আঘাত হেনো না।···এবার তুমি যেতে পারো।

কবি-শিষ্য বিদায় নিলেন। এবার বড়ো বড়ো চোখে আর চড়া স্বরে বিশ্বকবি উপস্থিত সকল ছেলেমেয়েকে সচকিত করে তুললেন। বললেন : জানো, কেন আমি ভোরের পাখিকে ভালোবাসি। ওরা জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে। ওদের কর্ত্তব্যবোধও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। শেষ রাতের গানে ওরাই পৃথিবীর ঘুম ভাঙায়। তারপর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যে যার কাজে লেগে পড়ে। দূর-দূরান্তে ছুটে চলে তখন। তখন ওরা কর্ম্মমুখর। তারপর সমস্ত দিনের শেষে ওরা আবার ফিরে আসে আপন নীড়ে। খায়-দায় খেলা করে। রাত্রির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওরা গান ধরে। ঘোষণা করে দিন-শেষের। সুরে সুরে ঘরে ঘরে এনে দেয় রাত্রির আমেজ। তারপর আবার নীরব। রাত্রির অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে পরের দিনের সূর্যোদয়ের স্বপ্ন নিয়ে।······

তোমরাও ওদের মত কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে—ঐ আশাতেই ভোরের পাখির মত আমি তোমাদের ভালোবাসি। তাই তোমরা প্রতি ভোরেই ভোরের পাখির মত গান করো; আনন্দে অধীর হয়ো। তখন কারো শাসনে ভয় পেয়ো না। কিন্তু কর্ত্তব্যবেলায় যেন কাউকে এসে আবার শাসন করতে না হয়।

অপরাধীর মন নিয়ে আসা সকলেই এবার সকলের দিকে তাকায়। সবার চোখে-মুখেই বিস্ময়ের ছায়া। চোখ ফুটে প্রশ্ন বেরোয়—কৈ, শাস্তি পেলাম না তো! কবি আমাদের এত ভালোবাসেন! সকলের মনে হাজার রকমের প্রশ্ন তোলপাড় করে ওঠে। তারপর সব প্রশ্ন মনে চেপে, আনন্দ-ভরা মনে কবিকে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সবাই বিদায় নেয়। ভোরের পাখির মতই ওরা এবার ফিরে চলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে—নূতন জীবনের নূতন স্বপ্ন নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি বৈশিষ্ট্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বাঙলার জাতীয় জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল এক গভীর দুর্যোগময়ী তিমির রাত্রি। প্রচণ্ড দুর্যোগ এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল—বাঙালী তখন তাহা দেখিতে পায় নাই, বুঝিতে পারে নাই, দুর্যোগক্লিষ্ট নিদ্রাতুর বাঙালীর মন অনুমান পর্যন্ত করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শতাব্দী-রাত্রির যখন অবসান হইল, তখন—

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।"

সর্বনাশ তখন হইয়া গেছে।

নব প্রভাতে নবীন উদ্যমে বাঙালী তপস্যা আরম্ভ করিল। জাতীয় সাধনার তপস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন সেই সাধনার খণ্ড খণ্ড সিদ্ধির প্রকাশ। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড সিদ্ধি এক অখণ্ড সিদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই শতাব্দীর সাধনা পূর্ণতম জ্যোতিতে বিকশিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত হইলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের সম্মুখে রাত্রি সমাগত। সে রাত্রি শুক্লা অথবা কৃষ্ণা—তাহা এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সে বিচারের পূর্বে যে আলোকের দেবতা অস্তমিত হইলেন তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে।

রবীন্দ্রপ্রতিভা লোকোত্তর, অলোকসামান্য; সার্থকনামা রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীর সূর্য। বিগত বহু শতাব্দীর মধ্যে আমাদের

জীবনে যে শতাব্দীর সূর্যসমূহের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি, নিঃসন্দেহে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কল্যাণময় মহাদ্যুতি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিকে গিরিশিখর হইতে গহন অরণ্যতল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। কোথাও করিয়াছে কাঞ্চন-জজ্ঞার সৃষ্টি—কোথাও হইয়াছে নূতন বীজ উপ্ত, ভাবী মহাদ্রুমের জন্ম। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মনীতি, শিল্প, জাতিগঠন—এমন কোন বিভাগ আজ বাঙালীর জীবনে নাই—যে-বিভাগ রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়, সে প্রতিভায় সমৃদ্ধ নয়। আমি বাংলা সাহিত্যের একজন সেবক—গল্প-উপন্যাস লইয়াই আমার কারবার, আমার সাধনক্ষেত্র হইতে এই শতাব্দীর সূর্যের এক ভগ্নাংশের যে পরিচয় সেই পরিচয় সম্বল করিয়াই প্রণাম জানাইব। বিশেষ করিয়া ছোটগল্পের কথাই বলিব।

বাংলা সাহিত্যে কাব্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে কাব্যবৃক্ষ মরণোন্মুখ হইয়াছিল, মহাকবি মাইকেল যে বৃক্ষকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির উত্তাপ এবং বর্ণসম্ভার তাহাতে সঞ্চারিত হইয়া সে-বৃক্ষে নবশাখা পল্লব উদ্‌গত হইয়াছে, ধরিত্রীর বৃক্ষে স্বর্গের পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুধাস্বাদী অমৃতফলে সে-বৃক্ষ আজ ফলবান।

উপন্যাস আমাদের দেশে ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র সে বৃক্ষের বীজ, তিনিই এ বৃক্ষের কাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ তাহার মূল শাখা; কিন্তু ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথই বীজ, তিনিই কাণ্ড, তিনিই তাহার মূল শাখা—পরবর্তীগণ সে বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প এবং ফল। আমাদের দেশে রূপকথা ছিল, জাতকের উপাখ্যান ছিল, পঞ্চতন্ত্রের গল্প ছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্য আজ যে ছোট গল্পের সম্ভারে সমৃদ্ধ, যে সমৃদ্ধি পৃথিবীর যে কোন দেশের ছোটগল্পের সমৃদ্ধির পাশে কুণ্ঠাহীন

গৌরবে স্থান পাইবে—সে ছোট গল্প আমাদের সাহিত্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথই তাহার স্রষ্টা এবং তিনিই তাহাকে পরিপূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট। কোন দেশের কোন ছোটগল্প লেখকের গল্পের মধ্যে সে বৈশিষ্ট্য নাই। সেই বৈশিষ্ট্যকে অনেকে বলেন—কাব্যধর্মী। অবশ্য কবি-দৃষ্টি, সিদ্ধ কবি-দৃষ্টি ভিন্ন এই ধারার সৃষ্টি অসম্ভব; কিন্তু "কাব্য-ধর্মী" বিশেষণটি যদি ছোটগল্পের গৌরবকে খর্ব করিবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তবে তাহা যে একান্ত মিথ্যা এবং স্থূল মনের বিচারসম্ভূত বিশেষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব—কাব্যে যাহা সীমার সহিত অসীমের যোগ—ছোটগল্পে তাহাই ব্যক্তির সহিত বিশ্বের যোগসাধন করিয়াছে। আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি না, বিশ্বমানব এবং জীবের দুঃখের সমষ্টিভূত যে-দুঃখের সুর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া অহরহ ধ্বনিত হইতেছে, যাহা আমরা শুনিতে পাই না অথচ যাহা অতি বাস্তব—এক ঐক-তান, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি দুঃখের সহিত যাহার সংযোগ এবং সংগীত রহিয়াছে, তাহারই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য, এ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর গল্প সাহিত্যে একান্তভাবে দুর্লভ। গল্পের রস বা রূপকে ইহা ক্ষুণ্ণ করে নাই, সমৃদ্ধ করিয়াছে। এ রসোপলব্ধির আনন্দ আমাদের চৈতন্যলোকে সূক্ষ্মতর চেতনার সঞ্চার করে। রসোপলব্ধির আনন্দের মধ্য দিয়া পাঠকের ব্যক্তিগত চিত্তের সহিত মুহূর্তের জন্য নিখিল ধরার চিত্তলোকের সংযোগ স্থাপিত হয়। ছোটগল্পের কলা-কৌশলের দিক দিয়া অনেকে এই সংযোগের সুর ধ্বনিত হওয়ায় রসহানি এবং ব্যাকরণদুষ্টির অভিযোগ করিয়া থাকেন। এই

হিসাবেই কাব্যধর্মী গীতিধর্মী বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অথচ রসোপলব্ধির দিক দিয়া এর সুর অপূর্ব—ইহাও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেন। সুতরাং ইহার ব্যাকরণত্রুটির অপরাধে বৈয়াকরণিকের অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রসঙ্গে এ যুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলালের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব। —"গল্পগুচ্ছের মত সাহিত্যসৃষ্টির কথা মনে করিলে অবাক হইতে হয়, রবীন্দ্র প্রতিভার যাদুশক্তির এত বড় নিদর্শন আর নাই।... গল্পগুচ্ছের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে—বাহিরের জীবন ও জগতের রসরূপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কবির যে অহং মুক্তি ঘটে—সেই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে বিশেষ করিয়া গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে বাস্তবের গূঢ়তর এবং মহত্তর রূপ চিরন্তন রসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি যখন এই গল্পগুলি লিখিতেছেন তখনকার একখানি চিঠিতে আছে—

"সন্ধ্যাবেলায় যখন ছোট জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখনকার সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গ পদ্মার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন অন্ধকার অন্তঃপুরের মত মনে হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক—সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা—ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

এই মানসিক অবস্থায় যখন তিনি অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়াছেন, তখনই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের দুঃখিনী মেয়েটির ছোট হৃদয়ের দুঃখকে পৃথিবীর দুঃখের ঐকতানের সহিত সংযোগ করা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের পাষাণ কারায় বন্দী এক পাঠান পিতার দুঃখের সহিত নিখিল জগতের

সকল বিরহী পিতার দুঃখ এক করিয়া দিবার অনুভূতি তখনই অনুভব করা সম্ভবপর হইয়াছে। 'অতিথি' গল্পের তারাপদ, যে ঘরের স্নেহ মমতা—ভাবীঐশ্বর্যের প্রলোভনকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে দেখিল—

"সম্মুখে আজ যেন জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িতেছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে।"

অসীম বিশ্বপ্রকৃতি চলমান—সেই চলমান প্রকৃতির আহ্বানে চলার প্রেরণা—মানসিক এই স্তরোন্নতি ভিন্ন লাভ করা যায় না, অনুভবও করা যায় না। কিন্তু ইহা তো মিথ্যা নয়, ইহাই বাস্তবের গূঢ়তর এবং মহত্তর রসরূপ।

'শুভা' গল্পে—

"রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং বোবা মেয়ে মুখোমুখী বসিয়া থাকিত।...প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি হইলেও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট শুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বরূপী বিস্তার।"

'নিশীথে' গল্পটির মধ্যেও এই সুর ধ্বনিত হইতেছে। অনেকে এই গল্পটির মধ্যে অতি প্রাকৃতের শিহরণ অনুভব করিয়াও নায়কের মনোবিকৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই বড় প্রধানতম করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে কবিচিত্ত ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মনোবিকৃতির ঊর্ধ্বস্তরের মন—যে-মন পৃথিবীর সকল লালসা এবং কামনাকে জয় করিয়া—কলুষমুক্ত পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে চায়—সেই মন। সে মন অপরাধের স্পর্শ সহিবে কেন? তাই সে তাহার অপরাধকে বিশ্বব্যাপ্ত হইতে দেখিতেছে। ইন্দ্রিয়গোচর অপরাধকে অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাশমান দেখিতেছে। এই ভাবেই সকল সুখ দুঃখ, পাপ-পুণ্য ব্যক্ত হইতে হইতে বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের সংযোগসাধন, সুদুর্লভ অবাস্তব নয়, সুতরাং ছোটগল্পে ইহার প্রকাশ ছোটগল্পের মহিমাকে খর্ব তো করেই নাই—সুদুর্লভ মহিমাই দান করিয়াছে। ইউরোপের ছোট গল্প এইখানেই ভারতীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে যখন বাংলা ছোট গল্পের বিচার হইবে তখন এই গুণই বিশ্বকে বাংলা ছোট গল্পের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ইহা একটি বিশিষ্ট ধারা হইলেও অতি প্রাকৃত, খাঁটি সুখ দুঃখের বাস্তব কাহিনীর মধ্যে আরও কয়েকটি ধারা আছে। সমস্ত লইয়া আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। আজ সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের প্রণতি জানাইয়া ধন্য হইলাম।

গগনে উদিল রবি

স্বপনবুড়ো

[শেষ রাত। তখনো অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। দূরে পাহাড় নদী আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। ভোরের পাখীর ডাক শোনা গেল।]

ভোরের পাখীর গান

আমি ভাই ভোরের পাখী
আসবে যে এক নতুন কবি তার তরে ভাই রাত্রি জাগি
শিরে যে তার বিজয় মুকুট
জয়ের মালা গলে—
হাতে তাহার বাণীর বীণা
বাজছে পলে পলে।
রাত জাগি ভাই, গান গেয়ে যাই শুধুই তারি লাগি।
আসবে কবি তাই মেদিনী নীরবে সয় ব্যথা……
হৃদয়ে তার অসীম আশা, চক্ষে ব্যাকুলতা।
সেই শোনাবে নতুন গীতি
সেই জাগাবে নতুন প্রীতি
তারি তরে গান-গেয়ে ভাই ঈশের আশীষ মাগি।

[অন্ধকারের প্রবেশ]

অন্ধকার। কে তুমি বে-আক্কেল বেরসিক ব্যক্তি! সক্কালবেলা ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে আমার আরামের ঘুমটা মাটি করে দিলে। যাও—যাও, এখান থেকে সরে পড়ো—

ভোরের পাখী। তুমি এমন মার-মুখো হয়ে তেড়ে এলে কেন ভাই? কি তোমার নাম?

অন্ধকার। [ব্যঙ্গ করে] কি আমার নাম? এই বনে বাস করছ, আর আমাকে চেন না? আমার পোষাকটা দেখছ?

ভোরের পাখী। দেখ্‌ছি বৈ কি?

অন্ধকার। কি এর রং?

ভোরের পাখী। ঘোর কালো!

অন্ধকার। ঘোর কালোকে কি বলে?

ভোরের পাখী। ঘোর কালে মানেই একেবারে অন্ধকার।

অন্ধকার। ঠিক ধরেছ। আমি অন্ধকারই বটে! অন্ধকারে এতটুকু আলো ঢুক্‌তে পারে না। তাই আমি এই বনের মধ্যে বাসা বেঁধেছি। গান, সুর আমার কানে যেন সীসে গলিয়ে ঢেলে দেয়। আলো আমি আদৌ সইতে পারি না। তা তুমি এখানে এসে অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে চেঁচামেচি সুরু করেছ কেন?

ভোরের পাখী। ও! তুমি এখনো শোন নি?

অন্ধকার। কি আবার শুনবো শুনি? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি!

ভোরের পাখী। এই বনে যে আজ নতুন কবির উদয় হবে। তার আলোতে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠবে।

অন্ধকার [বিষম চটে গিয়ে] কী বললে! কী বললে! কী বললে? নতুন কবির উদয় হবে? বনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠবে? আচ্ছা, সকাল হবার আগেই তুমি এমন অলক্ষুণে কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি কি জানো না যে, এ বনে চিরকাল অন্ধকার থাকে? এটা আমার রাজ্যি। এখানে কেউ আলো জ্বালতে পারবে না।

ভোরের পাখী। এতকাল সেই কথা শুনেই ত ঝিমিয়ে ছিলাম। এইবার কে যেন কানে কানে বলে গেল যে, নতুন কবি আসবে, বনে আলো জ্বলবে—সবাই জাগবে।

অন্ধকার। [ঠাট্টা করে] কে যেন কানে কানে বলে গেল! বটে! কোন্ বে-আক্কেল তোমার কানে কানে বললে শুনি?

[নীল রঙের হাল্‌কা ওড়না পরে মলয়ার প্রবেশ]

মলয়া। আমি বলেছি গো, আমি। সকলের কানে কানে শুভ-বারতা শোনানোই যে আমার কাজ!

অন্ধকার। বটে! শুভ বারতা! তা কি শুভ বারাতাটি তুমি বয়ে নিয়ে এসেছ শুনি? তোমার পরিচয়ই বা কি?

মলয়া। আমার পরিচয়? অন্ধকারে যারা মুখ গোমড়া করে বসে থাকে, তারা আমার পরিচয় কি করে পাবে?

অন্ধকার। আহা! অত গুমরই বা কেন? এ বনে তুমি ঢুকলে কি করে? লক্ষ্মী মেয়ের মত পরিচয়টা আগে দিয়ে ফেল তো!

মলয়া। আমার নাম হচ্ছে মলয়া। ফুরফুর করে আমি বয়ে চলি। দেশ দেশান্তরে আমার অবাধ গতি। এই বন এতদিন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ছিল। তাই ত আমি আমার নীল ওড়না উড়িয়ে এলাম শুভ বারতা দিতে।

অন্ধকার। তুমি কি জানো না যে, এই বনের মালিক আমি? এখানে অন্ধকারের রাজ্যি? তোমাদের ফুরফুরে হাওয়া আর প্যানপেনে গান এ বনে চলবে না আমি যতদিন আছি। এই তোমাদের সোজা কথা বলে দিচ্ছি।

ভোরের পাখী। তুমি তো সোজা কথা বলে দিলে! কিন্তু আমার গলা থেকে যে আপনা আপনিই গান বেরুচ্ছে। তুমি বলছ

সোজা কথা, আমি বলছি সোজা কথা। মাঝখান থেকে কথা যে ছুটো হয়ে যাচ্ছে!

অন্ধকার। উঁহু, এই অন্ধকার রাজ্যে কথা শুধু একটি থাকবে, আর সেটি হচ্ছে আমার মুখের কথা ;—এই অন্ধকারের আদেশ, বুঝলে?

মলয়া। কিন্তু আমি যে চিঠি নিয়ে এসেছি—সে চিঠি বিলি করবো কার কাছে?

অন্ধকার। [আঁৎকে উঠে] চিঠি! চিঠি আবার কিসের? তুমি তো মেয়ে বাপু সুবিধের নও! প্রথমে বললে শুভ বারতা। এখন বলছ চিঠি। প্রতি মুহূর্তে কথা পালটানোই বুঝি তোমার কাজ? আমার বাপু এক কথা—অন্ধকার। চুপচাপ! নিঝ্‌ঝুম। আর কিছু না।

মলয়া। কিন্তু দেশ-বিদেশ, বনে-বনান্তরে সবুজের লিখন বয়ে নিয়ে যাওয়াই যে আমার কাজ। আজ আমি এসেছি এই অন্ধকার বনে চিঠি বিলি করতে। সে লিখন আমি কার হাতে দিয়ে যাবো?

অন্ধকার। না বাপু। চিঠি নেবার লোক এ রাজ্যে কেউ নেই। কেউ এখানে পড়তে পারে না। চোখ বুজে ঘুমুতে সবাই জানে। দেখ বাপু মলয়া, এ বন থেকে তুমি অন্য দেশে চলে যাও। এখানে তোমার চিঠি কোনকালেই বিলি হবে না।

মলয়া। তবে কি আমি ফিরে যাবো?

[ঝলমলে রঙীন লালপোষাক পরে উষার প্রবেশ]

উষা। না বোন, তুমি ফিরে যাবে কেন? তোমায় সাহায্য করতেই যে আমি এলাম।

অন্ধকার। [মুখ ভেংচে] ও, তুমি এলে! তা' তোমায় কে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে শুনি? ঝলমলে লাল টকটকে পোষাক, বিদ্যুতের গায়ের রঙ, কপালে সোনালী টিপ—আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে কে তুমি এলে, শুনি?

ঊষা। এতদিন এ বনে ঢোকবার পথ আমি খুঁজে পেতাম না—

অন্ধকার। আজও না হয় নাই খুঁজে পেতে সে পথ। তোমায় পথ দেখালে কে শুনি?

ঊষা। আমি ঊষা। তাই রবির আগমনবার্তা ঠিক সময় মতো আমি পেয়ে গেছি। গগনের কিনারে কিনারে আমারই তো আবির ছড়িয়ে দেবার কথা।

অন্ধকার। ও, তুমি আবির ছড়িয়ে দেবে? আমি কিন্তু সোজা লোক নই রাঙা ঊষার মেয়ে। আমি যখন রাগবো, আলকাতরা দিয়ে সব ঢেকে দেবো। তখন দেখে নিও তুমি। তাই বলছি আমায় চটিও না।

ঊষা। কালোকে, অন্ধকারকে দূর করে দেয়াই তো আমার কাজ।

অন্ধকার। আরে, কেরে পুঁচকে মেয়েটা! এটা আমার রাজ্যি, আর আমাকেই কিনা দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায়! না, এই ঊষা মেয়েটিকে আগে তাড়াতে হল দেখছি। এরা বসতে পারলে শুতে চায়!

ঊষা। আমাকে তাড়াবে? আমি রাঙা করে দেবো তোমার এই বন।

ঊষার নাচ ও গান

আমি রাঙা ঊষা জাগি পূব গগনে
শিশু রবি ওঠে তাই শুভ লগনে!

ফাগ মাখি সারা গায়
ও মলয়া, সাথে আয়।
আলোর পতাকা ধরি বন ভবনে
অন্ধকারের আমি বিষম অরি -
আলোর প্লাবন মাঝে বাহি যে তরী
রাঙা মেঘ ভেসে যায়
পাখী পাশে গান গায়
হাতছানি দিয়ে ডাকি নব-তপনে।

অন্ধকার। ও বাবা! এতক্ষণ অবাক হয়ে তোমার নাচ দেখছিলাম, গান শুনছিলাম। তুমি একা এসে আশ মেটেনি, আবার আর একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছো। আমার বনে ও সব চলবে না। বেরোও, বেরোও বলছি শিগগির!

[হঠাৎ কোকিলের প্রবেশ]

কোকিল। কুহু, কুহু, কুহু! আজ এমন শুভদিনে, শুভক্ষণে উষাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমিও যে ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলাম।

অন্ধকার। বটে! ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলে! তোমার কথাগুলি তো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলো। কিন্তু এমন বেয়াড়া কেন বলো দেখি?

কোকিল। এ কথাটা তুমি বললে কেন ভাই? বেতালা আমরা চলি না, আর বেসুরো আমরা গাই না!

অন্ধকার। তাতো চলো না, আর গাও না। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে অন্যের বাড়ীতে এমন হুট বলতে ছুট করে চলে আসো কেন বলতো? কি তোমার নাম?

কোকিল। আমার নাম কোকিল। ভালো খবর থাকলে আমি বনভূমিকে জানিয়ে যাই।

অন্ধকার। নাই বা তুমি বনভূমিকে জানালে। এখানে সবাই দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে আছি—সেটা বুঝি তোমা'র সহ্য হচ্ছে না? পরের ভালো তোমরা বুঝি দেখতে পার না?

কোকিলের নৃত্য-গীত

কুহু কুহু গান গেয়ে যাই নীরব নিঝুম বনের শাখে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত আমায় সবাই ডাকে।
এ বন থেকে বনান্তরে
সুরের ধারা আপনি ঝরে
জগৎ করে কোলাকুলি—সবাই এসে কুশল মাগে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত' আমায় সবাই ডাকে॥
সুরের ধারায় স্নান করাবো অশান্ত এই ধরা
এ দেশ হবে চিরসবুজ থাকবে নাকো জরা।
জগৎ পারাবারের তীরে
সকল মানুষ জুটবে ফিরে -

আসবে এবার নতুন কবি, আয় না বরণ করবি তাকে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত' আমায় সবাই ডাকে॥

[গানের শেষে ছয়টি ঋতু নাচতে নাচতে বরণডালা সাজিয়ে এসে ঢুকলো। তাদের দেখে অন্ধকার খুব ভয় পেয়ে গেলো]

অন্ধকার। ওরে বাবা! তোমরা যে দলে কেবলই ভারী হয়ে উঠছো! তোমার গান শুনে এই ছয় জন এসে যে হাজির হল, এরা কারা?

কোকিল। এরা হচ্ছে ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এই ছয় ঋতু আজকে নতুন কবিকে বিভিন্ন ঋতুর ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে।

অন্ধকার। [ভয় পেয়ে] বরণ—বরণতো করছ, কিন্তু এদিকে আমার যে মরণ হয়ে উঠলো! আমি এখন কোথায় যাই—কার পরামর্শ নিই! আমার রাজ্যে এইসব বাইরের লোক কোথা থেকে এসে জুটলো! কে শত্রু, কে মিত্র—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

গ্রীষ্ম। কেন ভাই! আমরা সবাই মিত্র। গ্রীষ্মের কালবৈশাখীর ঝড়ে যা কিছু অকল্যাণকর আমি দূর করে দেবো।

বর্ষা। আমার বর্ষার বরিষণে মেদিনীকে শস্য-শ্যামলা করে তুলবো। তোমার বনভূমি সবুজ হয়ে উঠবে।

শরৎ। শরৎকালের মাধুরিমায় শিউলি ফুলের সবুজ গন্ধে, কাশফুলের দোলনে, শরতের হালকা মেঘেয় ভেলায় তোমায় কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাবো।

হেমন্ত। হেমন্তের ফসলের প্রাচুর্যে তোমার বনভূমিকে আমি সকল দিক দিয়ে পূর্ণ করে রাখবো। অভাব তোমার এতটুকু থাকবে না।

শীত। শীতের দিনে অনুরাগে তোমায় নিবিড় করে কাছে টেনে নেবো।

বসন্ত। বসন্তের পুষ্প-সম্ভারে আমরা তোমায় আপনার করে নেবো। গানে-গানে সকল ব্যথা দেবো ভুলিয়ে!

অন্ধকার। কথার মারপ্যাঁচে তোমরা দেখছি আমায় সপ্তম স্বর্গে নিয়ে তুলছো। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি—লোক তোমরা মোটেই ভালো নও! নইলে এই শেষ রাত্তিরে এসে আমার আরামের ঘুমটা নষ্ট করে দাও?

ভোরের পাখী। সত্যি বলছি ভাই অন্ধকার, তুমি আমার সঙ্গে মিতালি পাতাও।

মলয়া। আমি তোমার ছোট্ট বোন। ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়ে তোমায় আমি শাস্ত করে রাখবো। তাহলে বুঝতে পারবে আমরা সবাই তোমার মঙ্গল চাই।

ঊষা। ভোরের ঊষার ফাগ মাখিয়ে তোমায় রঙীন করে রাখবো। তোমার মনও রঙীন হয়ে উঠবে। যাদের শত্রু মনে করছ, তারা হয়ে উঠবে তোমার আপনার জন।

কোকিল। কুহুতানে আমি তোমার মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেবো ভুলিয়ে। তাহলে বুঝতে পারবে—সারা বিশ্ব তোমার কত আপনার!

অন্ধকার। না না, তোমরা সব মায়াবীর দল! কথায় ভুলিয়ে আমায় বশ করতে চাও! তারপর সুযোগ বুঝে এই অন্ধকার-পুরী থেকে আমায় দেবে তাড়িয়ে। বেরোও সব, নইলে আমি একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো—হুঁ।

ছয় ঋতু। সবাইকে তুমি তাড়াতে পারো, কিন্তু আমাদের এই ছয় বোনের কথা তোমায় শুনতেই হবে। পাগল ভাইকে কি করে শাস্ত করতে হয়, তা আমরা জানি!

অন্ধকার। অ্যাঁ! তোমরা আমায় ভাই বলে ডাকলে! আমার এই কালো চেহারা দেখে তোমরা ভয় পেলে না? সত্যি করে বলো, আমায় ঘৃণা করো না তোমরা? আমি তোমাদের ভাই! চাঁদের আলোর মত ফুটফুটে আমার ছয়টি বোন আছে। অন্ধকারের কোটরে বসে এ কথা আমি কোনদিনের তরেই ভাবতে পারিনি।

ছয়ঋতু। কেন ভাবতে পারবে না ভাই? সত্যি আমরা তোমার ছয়টি আদরের বোন। আমাদের অন্ধকার দাদাকে নাচ দেখাতে আর গান শোনাতে এসেছি। আমাদের গান শুনলে নাচ দেখলে তোমার সব অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। তুমিও এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

অন্ধকার। আমার ছ'টি বোন! কি আনন্দ! তোমরা গাও—আমি চোখ বুজে শুনি!

ছয়টি ঋতুর গান

ধূলির ধরায় আমরা ছ'বোন ফুটাই কুসুম রাশি
দুঃখ বেদন সব ভুলিয়ে হাসি মধুর হাসি।
বাজছে মনে প্রীতির বাঁশী
তাইত ভায়ে দেখতে আসি
মঙ্গলেরই আমরা মিতা, নইকো সর্বনাশী!
শান্তি-বারি ছিটাই মোরা এই ধরণীর বুকে
দুখের দিনে কাঁদব আসি, হাসব সাথে সুখে।
রঙীন ফুলে মাল্য গাঁথি
আমরা আবার উঠব মাতি
কান্না হাসির ছয়টি মালায় সবায় ভালোবাসি
ধূলির ধরায় আমরা ছ'বোন ফুটাই কুসুমরাশি।

[অতি আনন্দে অন্ধকারের চোখে জল এসেছিল]

অন্ধকার। সত্যি, তোরা এত ভালো! আর আমি তোদের দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম!

প্রণাম নাও

নদীর প্রবেশ

[সুন্দরী শ্যামলী মেয়ে, চোখে মায়া অঞ্জন, হাতে ধান্যগুচ্ছ]

নদী। দূর করে তাড়িয়ে দিলে ত চলবে না ভাই। সকলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আমার যাওয়া আসা। কাছে টেনে নেব সবাইকে।

অন্ধকার। তুমি আবার কে বোন? মায়া-অঞ্জন চোখে পরেছ— নীল রঙের বেশ, হাতে ধান্যগুচ্ছ।

নদী। আমি নদী। দেশ-দেশান্তরের বুকের ওপর দিয়ে আমি চলে যাই। কবি বলেছেন—"যে পথ দিয়ে চলিয়া যাবো, সবারে যাবো তুষি।" আমিও যে পথ দিয়ে যাই, দু'পাশ শস্য-শ্যামলা করে তুলি। শুধু কি তাই? এক দেশের ভাবধারা আর এক দেশে বয়ে নিয়ে গিয়ে বপন করে আসি। আজ মলয়া খবর পৌঁছে দিলে যে, কবি আসছে; তাইতো তার ভাব, তার ভাষা, তার ছন্দ, তার মিল দেশে দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি। কই আমাদের তরুণ কবি? তার আসবার শুভলগ্ন কি এখনো আসেনি?

কোকিল। লগ্নের আর বেশী বাকি নেই। সেইজন্যেই তো আমি আগে থেকে এসে আগমনী গান গেয়েছি।

নদী। তোমরা গেয়েছ আগমনী, আর আমি বয়ে নিয়ে যাবো কবির বাণী। সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবির বাণী শোনবার জন্যে। গ্রহে-গ্রহে, তারায় তারায় চলেছে কানাকানি। সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে প্রহর গুনছে তার পদধ্বনি শোনবার জন্য। কিন্তু কবির বাণী বয়ে নিয়ে যাবো আমি।

নদীর নাচগান

কুলু-কুলু ধ্বনি মোর শুনেছ কানে ?
সে শুধু পরাণ পায় কবির গানে।
ছন্দের জাগে দোল
মধুবাণী......হিন্দোল
ভাব ও ভাষায় সে যে বন্যা আনে।
(শুনেছ কানে ?)
ফুলপরী জেগে ওঠে সে বাণী শুনে -
সুরধুনি হেরে যায় ছন্দ গুণে !
জোছনায় পায় লাজ,
তারা দল খোলে সাজ
শিশু রবি কোন্ সুধা ধরায় আনে।

[পাহাড়ের প্রবেশ]

পাহাড়। কবির আগমনের সংবাদ পেয়ে সুধা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে এলাম তোমাদের মাঝখানে—সে সুধার ভাগ নিতে।

অন্ধকার। তুমি কে ভাই ? বিরাট তোমার চেহারা। সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ তোমার দেহ, দীর্ঘ তোমার বাহু। তোমায় তো এ অঞ্চলে কখনও দেখি নি !

পাহাড়। আমি পাহাড়। কবির বাণী লাভ করে আমি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকবো। যুগ যুগ তপস্যা করব সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে। কবি কি এখনো এসে পৌঁছোয় নি ? শুকতারা আমায় বলে দিলে যে, কবির আসবার সময় হয়ে গেছে।

নদী। শুকতারা, শুকতারা তোমায় খবর পৌঁছে দিয়েছে? তবে আর দেরী নেই। কোথায় বরণডালা? কোথায় মঙ্গল-শঙ্খ?

সাগর। মঙ্গলশঙ্খ আমি নিয়ে এসেছি নদী, কবিকে অভ্যর্থনা করে নেবো বলে।

অন্ধকার। তুমি কে ভাই? ঊর্ম্মিমালা তোমার শিরে স্তব্ধ হয়ে আছে। তোমার দেহে অসংখ্য মণিমানিক্য। দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ তোমার হাতে! প্রবাল দিয়ে তোমার কটিদেশকে অলঙ্কৃত করেছ। কে তুমি?

সাগর। আমি সাগর। পৃথিবীর লোক আমার নাম দিয়েছে রত্নাকর। কত মণিমাণিক্য, মুক্তো, প্রবাল আমার অতলতলে ধূলির মত পড়ে আছে। তবুও আমার মন ক্ষণে-ক্ষণে গুমরে উঠে বলে, ওরে সাগর, এত ধনরত্ন থাক্‌তেও তুই নিঃস্ব, তুই সর্ব্বহারা; কবির বাণী বুকে ধারণ করে আয়, তবেই তোর রত্নাকর নাম সার্থক হবে। তাই ত আমি পাতালপুরী ছেড়ে ছুটে এলাম তোমাদের কাছে। কোথায় গেলে কবির দেখা পাবো, আমায় বলে দাও।

[সহসা মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। চারিদিক স্নিগ্ধ আলোয় ভরে গেল। এক শিশুকে কোলে নিয়ে পঁচিশে বৈশাখের প্রবেশ]

পঁচিশে বৈশাখ। কবি নিয়ে এলাম আমি। তোমরা সবাই দেখ, নয়ন-মন চরিতার্থ করো।

গগনে উদিল রবি

অন্ধকার। কে, কে তুমি? আমি এত আলো সইতে পারছি নে। আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে—আমি পালাই—রবির উদয় হলে অন্ধকার আপনিই মিলিয়ে যায়।

সাগর। কে তুমি? তরুণ কবিকে বক্ষে ধারণ করবার গৌরব লাভ করেছ?

পঁচিশে বৈশাখ। আমি পঁচিশে বৈশাখ। এই ত আমার গর্ব্ব যে, বিশ্বকে দান কোরছি সেরা-রত্ন। এই কবির বাণী শুনে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখ্‌বে। মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে আহ্বান করে মানুষ বল্‌তে পারবে, ওরে তোরা সবাই আমার আপন, কেউ পর নোস্—সুখে-দুঃখে, আনন্দে—বেদনায় সবাই সবাইকার ব্যথার ব্যথী। একের চোখের জল অপরে মুছিয়ে দেবে—জেগে উঠবে এক শান্তিনিকেতন।

সমবেত নৃত্য-গীত

এলো পঁচিশে বৈশাখ।
ডাক দিল প্রাণে প্রাণে সবাই বাজা শাঁখ
ভোরের পাখী থাকি থাকি বললে, খোকা ওঠ—
পূব আকাশের রঙিন আবির সবাই এসে লোট্
ওই মলয়ার ফুর-ফুরে বায় ফুল ফোটে লাখ্ লাখ্
সবাই বাজা শাঁখ
এলো পঁচিশে বৈশাখ।

কোকিল ডাকে কুহু তানে ছয়টি ঋতু আয় -
সবাই মিলে করবি বরণ সময় বয়ে যায়।

প্রণাম দাও

শুনবি নদীর কল ধ্বনি

তীরে বসে প্রহর গণি -

নতুন কবি গড়বে এবার আনন্দ-মৌচাক।

পাহাড়, সাগর দোল্‌না দোলায় তাদের তোরা

সবাই বাজা শাঁখ

এলো পঁচিশে বৈশাখ!

যবনিকা

"জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা—
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।"